শুকতারা
ষড়্‌বিংশ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন, নড়বার চেষ্টা করবেন না।

আহ্!

গুলির শব্দে অন্যরাও এদিকে আকৃষ্ট হলো!

তারপর তাকে তারা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিয়ে চললো।

এখন কিছু করা মানে হঠকারিতা, তবে মনে হচ্ছে প্রোফেসার বসুর কাছে এবার তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো!

এবং শেষে।

ঐ আমাদের গন্তব্যস্থল। আমার সঙ্গে আসুন।

বন থেকে ফিরে এসে পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য ফিরে চাইলেন। দুর্যোধন কিছুতেই দেবেন না।... যুদ্ধ বুঝি অনিবার্য। শান্তির সন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কৌরব সভায়।

অমৃত সমান মহাভারত-কথা

বোরোলীন
হাউস কর্তৃক প্রচারিত

দুর্যোধনের এক কথা,— বিনা যুদ্ধে কিছুই দেব না। তিনি কৃষ্ণকেই বন্দী করতে চাইলেন। —তাই বুঝি? নিমেষে শ্রীকৃষ্ণ অন্য মূর্তি ধরলেন। ভয়াবহ রূপ তাঁর। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ওঁরা দেখলেন মনোহর রূপ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ।...

যুদ্ধ।
কুন্তী ছুটলেন গঙ্গাতীরে, কর্ণের কাছে। নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন— অর্জুনেরা তোমার ভাই, তাঁদের হত্যা করো না। কর্ণ বললেন—হয় আমি থাকব, না হয় অর্জুন, তোমার পাঁচ ছেলেই থাকবে মা!

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অনবদ্য নিরাময়—!

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

হতচ্ছাড়া দুটোকে সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠাবার এক উপায় বের করেছি!
ওদের ঘরের মেঝে ফুটো করে তার ভেতর দিয়ে এই রবারের সাপটা ঢুকিয়ে দেবো!
ওরে বাবারে! মেঝে ফুঁড়ে সাপ বেরুচ্ছে রে!
বাঁটুলদা শীগগির এসে বাঁচাও!
শীগগির এসো! আমাদের শোবার ঘরে একটা সাপ ঢুকেছে!
ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি!
ওরা দেখে ফেলবার আগেই আমি এটাকে গারুটে পাচার করে ফেলি!
এই দেখো বাঁটুলদা! সাপটা এই গর্ত দিয়ে এসেছিলো!
মাক গে, এখন তো আর কোন চিহ্নই নেই!
আরে আরে! বাঁটুলের পকেটে ওটা কি!
বাঁটুলদা দেখো! সাপটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়নি তো?
হতে পারে! আচ্ছা আমি খুঁজে দেখছি!
না এখানে সাপ-টাপ নেই। কিন্তু ওটা একটা ভালো কাজ করেছে, ওদের সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠিয়েছে!
এটা দেখছি নকল সাপ!
রবারের তৈরি সাপ! এ শুধু আমাদের সকালে ঘুম ভাঙাবার কল! এটা দিয়ে উল্টে বাঁটুলকে জব্দ করবো!

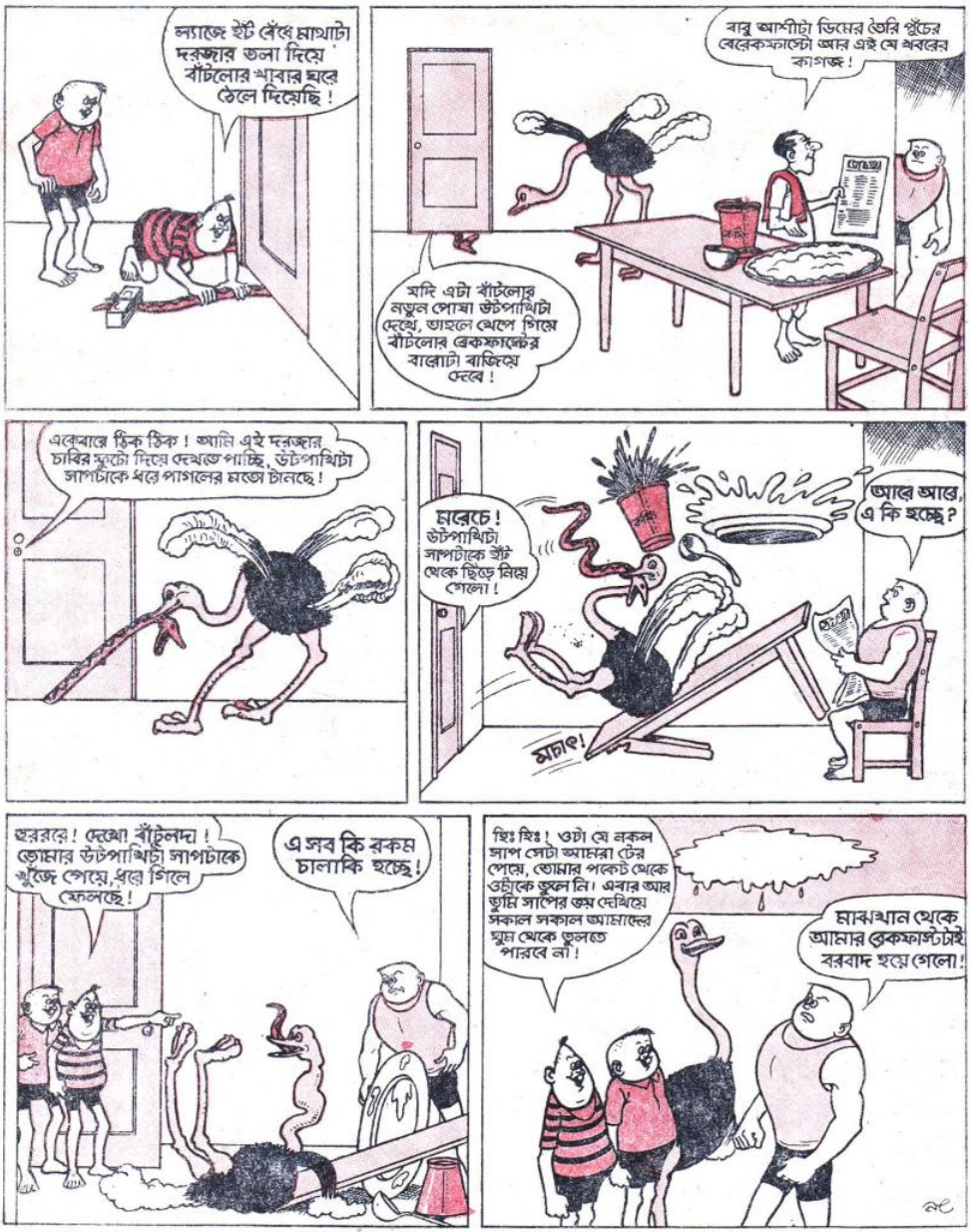
ল্যাজে ইঁট বেঁধে মাথাটা দরজার তলা দিয়ে বাঁটলোর খাবার ঘরে ঠেলে দিয়েছি !
বাবু আশীটা ডিমের তৈরি পুঁচের ব্রেকফাস্টো আর এই যে খবরের কাগজ !
যদি এটা বাঁটলোর নতুন পোষা উটপাখিটা দেখে, তাহলে খেপে গিয়ে বাঁটলোর ব্রেকফাস্টের বারোটা বাজিয়ে দেবে !
একেবারে ঠিক ঠিক ! আমি এই দরজার চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, উটপাখিটা সাপটাকে ধরে পাগলের মতো টানছে !
মরেচে ! উটপাখিটা সাপটাকে ইঁট থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেলো !
আরে আরে, এ কি হচ্ছে ?
মচাৎ!
হররে ! দেখো বাঁটুলদা ! তোমার উটপাখিটা সাপটাকে খুঁজে পেয়ে, ধরে গিলে ফেলছে !
এ সব কি রকম চালাকি হচ্ছে !
হিঃ হিঃ ! ওটা যে নকল সাপ সেটা আমরা টের পেয়ে, তোমার পকেট থেকে ওটাকে তুলে নি। এবার আর তুমি সাপের ভয় দেখিয়ে সকাল সকাল আমাদের ঘুম থেকে তুলতে পারবে না !
মাঝখান থেকে আমার ব্রেকফাস্টটাই বরবাদ হয়ে গেলো!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	পরখ করা (কবিতা) ...	আশা দেবী ...	৪৬৫
৪।	মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা (জীবন কথা) ...	অশোক পোদ্দার ...	৪৬৭
৫।	চোখ ছানাবড়া (হাসির কথা) ...	— ...	৪৬৯
৬।	ঈশ্বরীবর্মণ মৌখরী (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৪৭০
৭।	এক অদ্ভুত জীব (মজার ছবি) ...	— ...	৪৭৮
৮।	রহস্যময় জাহাজ (গল্প) ...	চিত্তরঞ্জন রায় ...	৪৭৯
৯।	৪৭৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৪৮২
১০।	শেষ রাতের অতিথি (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৪৮৩
১১।	কি আশ্চর্য (মজার ছবি) ...	— ...	৪৯০
১২।	ঘুম (গল্প) ...	পরিমলকুমার দে ...	৪৯১
১৩।	বিশ্বাসের কথা (জানবার কথা) ...	রিপ্লে থেকে ...	৪৯৫
১৪।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস ...	৪৯৬
১৫।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	৪৯৮
১৬।	আইন ভবন (জানবার কথা) ...	— ...	৫০৫
১৭।	জাবালুজা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৫০৬
১৮।	হাঁদা-ভোঁদার কুকুর পোষা (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৫১৪
১৯।	কলে কাগজ তৈরী (প্রবন্ধ) ...	পূরবী দেবী ...	৫১৬
২০।	গদরের প্রতিধ্বনি (শহীদ স্মৃতিকথা) ...	রঞ্জন মিত্র ...	৫১৯
২১।	ডাকাতের যম ঢেঁকি (জীবন কথা) ...	অম্বুজেন্দ্র ঘোষ ...	৫২৫
২২।	প্রেসিডেন্টের বাড়ি (জানবার কথা) ...	— ...	৫২৭
২৩।	শাপমোচন (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	অলক চক্রবর্তী ...	৫২৯
২৪।	"৺রেখা হাজরা স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	...	৫৩২
২৫।	বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	কৃষ্ণা আচার্য ...	৫৩৩
২৬।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৫৩৬

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১।১ রামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

everest/508d/PP BN

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা : ১৩৮০, ভাদ্র

পরখ করা

আশা দেবী

যত্ন করে গোঁফ রেখেছেন
বিষ্ণুচরণ নন্দি,
গোঁফ দেখিয়ে
তাক লাগাবেন,—
এইটি মনে ফন্দি।
গোঁফ দিয়ে সে সেলাই করে
চটের থলি বস্তা,
বাজারেতে দাম করে দেয়
একেবারে সস্তা।
ঘুটে মজুর দেখলে পরে
ওষুধ গোঁফে ভরে,
ইনজেকসন ফুটিয়ে দিয়ে
শুধোয়—"মাথা
ঘোরে?"

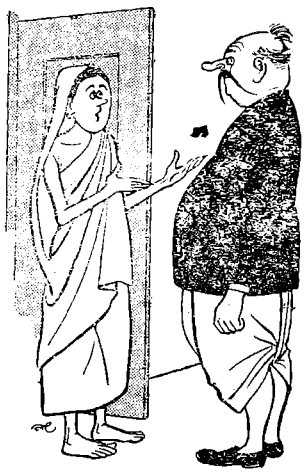

ভূতোর পিসী আন্নাকালি হঠাৎ হেসে কয়—
"বিষ্ণুচরণ জব্দ হবে"—কাজটা কঠিন নয়।
এই না বলে চললো সোজা নন্দীমশার কাছে,
বললে—"বাবা বিষ্ণুচরণ, একটা কথা আছে।"
সূচ তৈরীর কারখানাটা লক আউটে বন্ধ,
বেজায় রকম সূচের অভাব,—রুগীর কপাল মন্দ।
হেসে বলেন বিষ্ণুচরণ—"প্রমাণ দিব তারি—
জীবন দিব দেশের সেবায়—
গোঁফ কি এমন ভারী।"

আয়না আন ছবি তোল
শেষ বারেরই মত,
কত দিছি গন্ধ আতর
চাঁড়া দিছি কত।"
আন্নাকালি গিলছে কথা লোকে বাড়িময়
গোঁফের কদর পরখ হবে বিষ্ণুচরণ কয়।
গোঁফে ওষুধ ভরে সেটা
ফুটিয়ে পিসীর গায়,
গেলাম-গেলাম—গেছি গেছি
আন্নাকালি কয়।
পাড়ার লোকে ছুটে এলো
গাড়ি ঘোড়া বন্ধ,
"ইনজেকসন পরখ হলো"—
কাজটা তো নয় মন্দ।

তোমার গায়ে বউনি হলো
গোঁফের কদর কত,
ধন্যি পিসী আন্নাকালি—
যাও এবারের মত॥

অশোক পোদ্দার

'খুব সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেয়ো হে হানস্ হ্যাগার, ওতে আগুন লাগলে মানুষ কেন স্বয়ং ভগবান এসেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, পাক্কা তেইশ হাজার লিটার তরল অ্যাসিটোন মজুদ আছে ঐ ট্যাংকারটার ভেতরে। খুব সাবধান বাবা—খুব সাবধান।' ড্রাইভার হ্যানস্ হ্যাগারকে যাবার আগে কথাগুলো বলেছিল গাড়িটির মালিক।

শুনে কেবল সামান্য হেসেছিল মাত্র হ্যানস্ হ্যাগার। অ্যাসিটোন! পেট্রোলের চেয়েও ভয়ংকর দাহ্য পদার্থ! মালিক কি ওকে বুদ্ধু ঠাওরালো নাকি! আজ প্রায় বাইশ বছর হলো ড্রাইভারের চাকরি করছে হ্যানস্ হ্যাগর। সে কি জানে না কাকে অ্যাসিটোন বলে!

পশ্চিম জার্মানীর এক ছোট্ট শহর তেনিন্‌জেন। উনিশশো আটষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি সন্ধ্যা। মালিকের কথায় যে মনে মনে একটু দুশ্চিন্তা হয় নি এমন নয়—তবু সব ভাবনা হাওয়ায় ভাসিয়ে স্কুলিনের অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরীর দিকে গাড়িটা চালিয়ে দিল হ্যাগার। ছটা পনেরো নাগাদ ওখানে পৌঁছে গেল সে। এবার

মালটা ডেলিভারি দিতে হবে। নিয়মমাফিক চালানে সই-সাবুদ সেরে ফেলে ফ্যাক্টরীর আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টোরেজ ট্যাংকে প্রায় বেশির ভাগ অ্যাসিটোন হোস্ পাইপের সাহায্যে ভরে ফেলেছিল হ্যাগার। বিরাট ট্যাংকারটার ছয়টা চেম্বারের মধ্যে মাত্র একটার অ্যাসিটোন নিষ্কাষণ বাকী ছিলো কেবল—আর আচমকা হঠাৎ হ্যাগার লক্ষ্য করল ট্যাংকারটির পেছনে আগুন লেগেছে। একটা নীলবর্ণ আগুনের শিখা অতি দ্রুত ট্যাংকারটার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথমে স্তম্ভিত এবং অনেকটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সে—নাঃ আর সময় নেই হাতে একদম। একটু দেরি হলে ফ্যাক্টরীর স্টোরেজ ট্যাংকারে আগুন ধরে যাবে—বিরাট বিস্ফোরণে প্রায় আটশো শ্রমিক সমেত উড়ে যাবে বিরাট ফ্যাক্টরী। ওদের বাঁচাতেই হবে যেমন করে হোক। অজানা একটা ভয়ে প্রথমটা প্রায় যেন জমে বরফ হয়ে গেল হ্যাগার। মালিকের সাবধান-বাণী মনে পড়ল তার। 'ওতে আগুন লাগলে মানুষ কেন—স্বয়ং ভগবান এসেও তোমায় বাঁচাতে পারবে না হে হ্যাগার। একটু লক্ষ্য রেখো ওটার দিকে'…

ফ্যাক্টরীর ডিউটি শেষ হবার মুখে প্রায়। গেট দিয়ে একটা দুটো করে লোক বেরিয়ে আসছে এখন। রাস্তার চারিদিকে লোকজনের যথেষ্ট ভীড় আছে এখনো। একটা উপায় আছে—মাত্র একটা উপায়ই হাতে আছে এখন তার। ফ্যাক্টরীটা বাঁচাতে হলে খুব তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত ট্যাংকারটা বাইরে বের করে নিয়ে যেতে হবে—যথাসম্ভব দ্রুত অন্য কোনও পরিত্যক্ত, নির্জন স্থানে। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এখন। আগুনের শিখা দ্রুত পেছন হতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

ড্রাইভারের সিটে লাফিয়ে উঠে বসল হ্যাগার। তারপর ২০০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে সামনের দিকে চালিয়ে দিল। যা থাকে কপালে!—নিজে না হয় জ্বলেই গেল, তবু ফ্যাক্টরীর লোকগুলোকে তো বাঁচানো গেল। যাবার সময় সামনে একটা ব্রীজ পড়লো তার—উল্কাবেগে ব্রীজের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। যে কোন সময় গাড়িটা উড়ে যেতে পারে বিরাট বিস্ফোরণে—ইঞ্জিনে একবার আগুন লাগলে আর বাঁচতে পারবে না হ্যাগার।

তার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্বলে যাবে। আরে! সামনে আবার একটা লেভেল-ক্রসিং এসে গেল তার। একটা মালগাড়ির প্রায় পেছন ঘেঁষেই বলতে গেলে বেরিয়ে গেল তার জ্বলন্ত ট্যাংকার। রাস্তার লোকজন আতঙ্কিত চোখে লক্ষ্য করল একটা জ্বলন্ত ট্যাংকার সবেগে রাস্তার পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। গাড়ির স্পিড্ আরও বাড়িয়ে দিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের এক রাস্তায় নিয়ে এলো গাড়িটা হ্যাগার। জ্বলছে, প্রায় তিন মিটার উঁচুতে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে—নাঃ এখনো একটা ফাঁকা জায়গা

দেখতে পেল না হ্যাগার। ইঞ্জিনে আগুন লাগল বলে। সারা পিঠে আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করছে সে। একটা ফাঁকা জায়গা দরকার। একটা পরিত্যক্ত স্থান। কি করবে—কি করা যায় ভাবতে ভাবতে পেছনে দমকলের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল হ্যাগার। দমকলের লোকেরা তাকে জ্বলন্ত গাড়িটা থামাতে বলছে। স্কুলিন অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরীর একজন সময়মতো দমকলে খবর দিয়েছিল। ট্যাংকারটা থামিয়ে জ্বলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এল হ্যাগার। তারপর খানিকটা দৌড়ে 'অ্যাসিটোন' উচ্চারণ করে অজ্ঞান হয়ে গেল। প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং আগুনের তাপে জ্ঞান হারাল।

জ্বলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এল হ্যাগার।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যাগারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দমকলের লোকেরা ঘণ্টাখানেক ধরে জল ঢেলে শেষ পর্যন্ত আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। এক সপ্তাহ পরে আবার তার পুরোনো কাজ—অর্থাৎ অ্যাসিটোন নিয়ে যাবার কাজে যোগ দেয় হ্যাগার। এই কাজের জন্য পশ্চিম জার্মানীর ট্রাক অ্যাসোসিয়েসান হ্যান্স হ্যাগরকে বীরসূচক সম্মানে মহা সমারোহে ভূষিত করে।

চোখ ছানাবড়া—

একটা ছোট ছেলেকে একজন ডাক্তার কাশির ওষুধ দিয়েছিল। পরের দিন তাকে দেখতে এসে বললে, তোমায় যে কাশির ওষুধ দিয়েছিলাম তা এখনও খাচ্ছ তো।

ছেলেটি না ভেবেই উত্তর দিলে। আপনার ওষুধ একটু চেখেই মনে হল ওষুধ খাওয়ার চেয়ে কাশি থাকা ভাল।

ঈশ্বরীবর্মণ মৌখরী

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

দ্বারবঙ্গ ! বঙ্গদেশ প্রবেশের সিংহদ্বার।

এধারে ধবলা গঙ্গা, ওধারে আগমল পাহাড়। মাঝখানে সংকীর্ণ রৌদ্রস্নাত প্রান্তর। যুদ্ধ চলছে সেইখানে। এক পক্ষে অশ্বারোহী কনৌজিয়া, অন্য পক্ষে গৌড়িয়া পদাতিক।

ভীমবাহু এক মৌখরীর হাতে রণকুঠার বিদ্যুতের বেগে ঘুরছে ফিরছে আবর্তিত হচ্ছে, শত্রুশির ভুলুণ্ঠিত করে করে। মেঘবর্ণ রণতুরঙ্গ তাঁর রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠছে। কতক রক্ত তাঁর নিজের, কতক বা শত্রুর। ঘোড়া নিজেও অল্পবিস্তর আহত। গৌড়িয়া তীরন্দাজি এ-যুদ্ধে মারাত্মক হয়ে উঠেছে কনৌজিয়া বাহিনীর পক্ষে।

যুদ্ধ নতুন নয় এই দুই দেশের মধ্যে। ঈশ্বরীবর্মণ কনৌজ-সিংহাসনে আরোহণ করেছেন আজ প্রায় দশ বৎসর। ইতিমধ্যেই চার চারবার তিনি প্রবেশ করেছেন গৌড়-বঙ্গের অধিকারে। তিন তিনবার গৌড়েশ্বর সমাচারদেবকে সন্ধি ক্রয় করতে হয়েছে প্রভূত অর্থ উপঢৌকন এবং ভবিষ্যতে রাজকরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কর তিনি দিয়েছেনও, কিন্তু ঈশ্বরীবর্মণের পরাক্রম ওদিকে দিনের দিন বেড়েই চলেছে। উচ্চাশা তাঁর ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এখন আর তিনি শুধু মাত্র হাজার মোহর কর পেয়ে সন্তুষ্ট নন।

কী তবে চান মৌখরী নরপতি ?

তিনি চান সূক্ষ্ম গৌড় প্রদেশের বৃহৎ এক ভূখণ্ড। গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম পারে তিনি আর সমাচারদেবকে দাঁড়াতেই দেবেন না।

সমাচারদেব ঘৃণাভরে এ-দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই এই যুদ্ধ আজ। গৌড়িয়া

সেনারও প্রস্তুতি এবারে দস্তুরমত জোরালো। উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন, দক্ষিণে চট্টল পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে তাঁর সেনাপতিরা সৈন্য সংগ্রহ করেছেন সকল উপজাতি আর সকল সম্প্রদায় থেকে। তীরন্দাজ, সড়কিবাজ, গদাপাণি, লাঠিয়াল, সবশ্রেণীর জওয়ানই তিনি পেয়েছেন। সবাইকে এক শৃঙ্খলায় বেঁধে দেশাত্মবোধের একই পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন।

তাই এবারকার যুদ্ধ সঙ্গিন আকার ধারণ করেছে গোড়া থেকেই। সূর্যোদয়ে ভেরী বেজে উঠেছিল দুই শিবিরেই। গঙ্গাতরঙ্গে নবারুণের রাঙা ছোপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারবঙ্গের রুক্ষ প্রান্তর রাঙা হয়ে গেল রক্তস্নান করে।

মৌখরী সেনার পুরোভাগে ঐ যে রণকুঠারধারী ঈশ্বরীবর্মণ, পরশুরামের মতই দুর্জয় যোদ্ধা তিনি। গৌড় সেনা তাঁর সমুখ থেকে সভয়ে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ঘিরে ধরবার চেষ্টা করছে দুই পাশ থেকে। কাজেই ঈশ্বরীর অগ্রগতি অব্যাহত। তাঁর পেছনে তাঁর অশ্বারোহী সেনাও এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে ত যেতে পারছে না তারা। এক সময়ে অবাক্ হয়ে ঈশ্বরীবর্মণ লক্ষ্য করলেন যে সমুখের গৌড়িয়ারা সরে দাঁড়িয়েছে তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ে। পিছন থেকে সেনাপতি জয়দ্রথ বলে পাঠালেন, শত্রু সেদিক থেকেও তাঁকে বেষ্টন করে ফেলার চেষ্টা করছে।

এ কীরকম ব্যাপার? ঈশ্বরীবর্মণ যুদ্ধ বলতে বোঝেন বাহুবল। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরের মুণ্ডটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে, এইটাই যুদ্ধ সম্বন্ধে একমাত্র ধারণা তাঁর। কুঠারের আঘাত এড়িয়ে যদি কেউ পাশে সরে যেতে চায়, তিনি তাকে বীরোচিত কর্ম বলে মানতে প্রস্তুত নন।

কিন্তু ওরা যে তিনদিকে ঘিরে ফেলার ফিকির করেছে! ঈশ্বরীবর্মণ তা হলে করেন কী? মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তিনিও তিন দিকে লড়াই করেন কেমন করে? ব্যূহ-রচনার সনাতন নিয়ম আছে কতকগুলি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আমল থেকে আর্যবীরেরা সেই সব নিয়ম মেনে এসেছেন। এই বাঙ্গালীগুলিকে যে কমৌজিয়ারা অনার্য আখ্যা দিয়ে থাকে, তা একান্ত অকারণ নয়। এরা আজকের যুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত কাণ্ড-কারখানা করে চলেছে।

ঈশ্বরীবর্মণের নিজের দেহে গোটা পাঁচেক আঘাত লেগেছে। একটা আঘাত ভল্লের, বাকী সবই তীরের। কোনটাই খুব গভীর নয়, কিন্তু রক্ত ঝরছে সবগুলি থেকেই। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ঝরছে। এখনও তিনি নিজেকে দুর্বল মনে করছেন না অবশ্য। কিন্তু ক্ষতমুখ গুলোতে বন্ধন দেওয়া আবশ্যক বই কি!

দেওয়া যেত। অবসর পাওয়া যেত তার। যদি ঐ বাঙ্গালীরা শাস্ত্রমতে লড়াই করত। যুদ্ধ এতক্ষণ শেষ হয়েই ত যাওয়ার কথা। কিন্তু ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ এখনও

যেন আরম্ভই হয়নি! বেশ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে, ধীরে সুস্থে তীর ছুড়ছে, নিঃশব্দে এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় গিয়ে শ্রেণীবদ্ধ হচ্ছে।

একে ফন্দিবাজি বলা যেতে পারে, রণকৌশল বলতে রাজী নন ঈশ্বরীবর্মণ। আর ঐ একটা শব্দ 'রণকৌশল'! রণের আবার কৌশল কী? রণ তো বলের প্রতিযোগিতা বলেই জানা আছে ত্রেতা যুগ থেকে। রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছে, কৌশলের আশ্রয় রাম তো কদাপি নেন নি। রাবণ যে রাবণ, রাক্ষস মানুষ, তিনিও—

ওঃ, হ্যাঁ, মারীচকে স্বর্ণমৃগের আকারে পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ করবার মতলব তখন তাঁর ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ সীতাহরণ, একটা চুরির ব্যাপার। তারপর ধর, কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ। ওঃ হরি, কৃষ্ণ কিছু কিছু কৌশল করেছিলেন অবশ্য। জয়দ্রথ-সংহারের প্রয়োজনে সূর্যকে ঢেকে রেখেছিলেন সুদর্শন-চক্র দিয়ে। কুরুপক্ষে বুড়ো দ্রোণাচার্যও চাতুরী জানতেন বই কি! সংশপ্তক যুদ্ধে অর্জুনকে আটকে রেখে এদিকে অভিমন্যু বধ করলেন চক্রব্যূহ রচনা করে।

বটে বটে! আছে নজির। কিন্তু ঈশ্বরীবর্মণ ভীমের চ্যালা, কলকৌশলের ধার ধারেন না! কুঠার হাতে যুদ্ধে নেমেছেন, দেখে নেবেন গৌড়িয়ার বুদ্ধির ধার বেশী, না তাঁর কুঠারের ধার বেশী। তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এগুতেই থাকলেন। তাঁর ডাইনে বাঁয়ে পিছনে গৌড়িয়ারাও এগুতে থাকল তিন দিক বেষ্টন করে।

যুদ্ধ হচ্ছে, তবে সামনাসামনি নয়। পিছন থেকে তীর আসছে, দুই পাশ থেকে আসছে বল্লম আর সড়কি। মৌখরি সেনাও এক একবার দাঁড়িয়ে পড়ে তরোয়াল আস্ফালন করে নিচ্ছে। কিন্তু সে-তরোয়ালের নাগালের ভিতর আসছে না গৌড়িয়ারা।

ঈশ্বরীবর্মণ আদেশ দিলেন—"তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাও।"

শত্রুরা সবাই পদাতিক। সমান তালে দৌড়োনো অসাধ্য তাদের। ঘোড়ার সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেন? পিছলে পড়ে গেল তারা। ঈশ্বরীবর্মণ যে শত্রুকে পিছনে রেখে শত্রুর দেশের ভিতর ঢুকে পড়বেন এমন বেপরোয়ার মত, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল? নিতান্ত হঠকারী না হলে এমন করে না। এখন যদি দক্ষিণ থেকে নতুন একদল শত্রু এসে পথরোধ করে মৌখরীদের? কোথায় যাবে তারা? সমুখে পিছনে দুই দিক থেকে চাপে পড়ে চিঁড়ে চেপটা হয়ে যাবে না?

সত্যই ব্যবস্থা সেই রকমই ছিল সমাচারদেবের। ঈশ্বরীবর্মণ বেপরোয়ার মত আচরণ করবেন, তা অবশ্য তিনি অনুমান করেন নি। শুধু নিজের পৃষ্ঠরক্ষার জন্যই এক দল বাগদী সেনাকে রেখেছিলেন পাহাড়ের আড়ালে। তাদের সেনাপতি কাসুন্দা যখন শত্রুকে দেখল হাতের নাগালে, তখন স্বভাবতঃই তার মনে হল যে মূল সেনাদল

অবশ্যই পরাস্ত হয়েছে যুদ্ধে, এবার শত্রুর গতিরোধের ভার তারই উপরে। সে এগিয়ে পড়ল জয়ধ্বনি করে।

ঈশ্বরীবর্মণ তখন উত্তর মুখে ফিরে দাঁড়িয়েছেন গৌড়সেনাকে মুখোমুখি আক্রমণের জন্য। এবার নিজের বাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এভাবে, যাতে পাশ কাটিয়ে শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলবার সুযোগ না পায় আবার। কিন্তু হরি হরি! এ যে আবার নতুন বিপত্তি! দক্ষিণেও যে নতুন শত্রু!

—"তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাও।"
[পৃষ্ঠা ৪৭২

কী করা যায় এখন? এমন সংকটে আর কখনো পড়েন নি ঈশ্বরীবর্মণ। পরাজয় অনিবার্য তো বটেই। বিশাল বাহিনীর একটা প্রাণীও প্রাণ নিয়ে আজ এই রণক্ষেত্র থেকে কনৌজে ফিরবে, এমন আশা করা যায় না। তিনি আদেশ দিলেন—"গঙ্গার দিকে পিছন করে দাঁড়াও সবাই। একটা সমচতুর্ভুজ গড়ে ফেল। গঙ্গা থাকুক এক ভুজ, অন্য তিন ভুজে—উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়াও সৈন্যেরা। গঙ্গা থেকে আক্রমণ হওয়ায় আশঙ্কা কিছু দেখা যাচ্ছে না, অন্য যে-কোন দিক থেকেই আসুক, মুখোমুখি লড়বে। এগিয়ে যেও না কেউ উত্তেজনার বশে, খবর্দার!"

নতুন ভাবে চতুর্ভুজ ব্যূহ রচনা করে সবে শত্রুর আক্রমণের জন্য তৈরী হয়েছেন ঈশ্বরীবর্মণ, এমন সময় সত্যই এল যুগপৎ তিন দিক থেকে আক্রমণ। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বিঁধতে লাগল অশ্বের ও অশ্বারোহীদের গায়ে। মৌখরীদেরও তীরধনুক আছে বইকি। ধনুক গলায় বাঁধা ঘোড়াদের, তীর-ভরা তূণ যোদ্ধার পিঠে। সওয়ারের ইঙ্গিতে শিক্ষিত অশ্ব পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল, আর সওয়ারেরা অসি কোষবদ্ধ করে ধনুকে দিল টঙ্কার।

কিন্তু মুশকিল এইখানে যে অশ্বারোহীরা তরোয়াল বা কুঠারের যুদ্ধে যতখানি

পারদর্শী, তীর-ধনুকে ততটা নয়। দ্বিতীয়তঃ, গৌড়িয়ারা ঘোড়া লক্ষ্য করে যত তীর ছুড়ছে, সওয়ার লক্ষ্য করে তার অধেকও না। ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করতে পারলেই যে মৌখরীরা বিষহীন ভুজঙ্গে পরিণত হবে, এ তারা জানে। পদাতিক হিসাবে যুদ্ধ করা অশ্বারোহীদের পক্ষে খুবই কঠিন।

ঘোড়া পড়তে লাগল এক একটা করে। সমস্ত ঘোড়া ধরাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত গৌড়িয়ারা হাতাহাতি যুদ্ধে নামবে বলে তো মনে হয় না।

এক সময়ে ঈশ্বরীবর্মণের নিজের মেঘবর্ণ রণতুরঙ্গও পড়ে গেল সাংঘাতিক আহত হয়ে।

রণজয়ের আশা ক্রমশঃই দূরে অপসৃত হচ্ছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই যুদ্ধ করে চলেছেন ঈশ্বরীবর্মণ এবং তাঁর বীর সৈনিকেরা। ওপক্ষ থেকে আহ্বান আসছে ঘন ঘন "পরাজয় মেনে নিন মৌখরীরাজ! আপনার মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ করবে না।"

ঈশ্বরীবর্মণ, মুখে হাসি তাঁর, কিন্তু ললাটে ভ্রূকুটি, সে কথার কোন উত্তর দিচ্ছেন না। সেনাপতি জয়দ্রথের পানে তাকিয়ে একবার মৃদুস্বরে বললেন শুধু, "পরাজয়ের পরেও আবার মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে নাকি কিছু?"—সমানে শরবর্ষণ করে চললেন তিনি।

হতাহত উভয় পক্ষেই প্রচুর হয়েছে, এইবার গৌড়িয় সেনা এই মরণ-খেলার অবসান ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হল। তিন দিক থেকে তারা ঘনিয়ে এল মৌখরীদের পানে। মৌখরীরা বুঝল যে শেষমুহূর্ত সমাগত। এবার তারা নিজের নিজের জীবন বাঁচাতে চায়। এক একজন করে তারা ঝাঁপ দিতে লাগল গঙ্গার জলে। সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পেরুনো যে অসম্ভব, তা জেনেও। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা ভাটিতে গিয়ে ডাঙ্গায় উঠবে একখানে। সেটা অবশ্যই শত্রুর দেশই হবে। বন্দীও তারা হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। পরাজিত শত্রুকে ধরে রাখা বা কষ্ট দেওয়া আর্যরীতি নয়, দু'দিন পরে মুক্তি তারা পাবেই, স্বচ্ছন্দে ফিরতে পারবে কনৌজে।

কিন্তু এখন? রাজা পরাজয় স্বীকারে অনিচ্ছুক, সুতরাং শেষ পর্যন্ত চলবে যুদ্ধ। আর যুদ্ধ চলতে থাকলে কে বাঁচবে কে মরবে, তার ঠিক কী! নিরাপত্তা তাই একমাত্র ঐ গঙ্গার জলে। কেউ বলছে—"মহারাজ, ক্ষমা করবেন।" কেউ বলছে—"সেনাপতি, অনুমতি করুন" —আর সঙ্গে সঙ্গে জলে দিচ্ছে ঝাঁপ।

রাজা তা বলে ঝাঁপ দেবেন না। পরাজয়ের পরে জীবনধারণের কোন অর্থ বোঝেন না তিনি। তিনি হতে চেয়েছিলেন উত্তর ভারতের সম্রাট। অথচ এখন শুধু ছোট্ট কনৌজের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তাঁর আধিপত্য। দেশ বিদেশের লোক এই দ্বারবঙ্গের যুদ্ধের কাহিনী তুলে আড়ালে আড়ালে উপহাস করবে তাঁকে, সে-লাঞ্ছনা সইবে না তাঁর। মৃত্যুই শ্রেয়ঃ তাঁর পক্ষে।

তার বুঝি আর দেরিও নেই। অনেকক্ষণ থেকেই ক্ষতমুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। ভীমতুল্য বলবান ঈশ্বরীবর্মণও এখন চোখে আঁধার দেখছেন দুর্বলতায়। মৃত্যু বুঝি আসন্ন। তা বেশ, আসুক মৃত্যু। এ পরিস্থিতিতে মৃত্যুই তাঁর একমাত্র বান্ধব।

সেনাপতি তখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তাঁকে ডেকে রাজা বললেন—"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সৈনিকেরা যদি ইচ্ছা করে, গঙ্গায় নেমে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে পার সবাই। আমিও গঙ্গায় নামছি, তবে প্রাণ বাঁচাবার জন্য নয়, বাঁচতে চাইও না, আর সাঁতার দেবার শক্তি আমার দেহেও নেই। আমি জলে ঝাঁপ দিচ্ছি যাতে আমার মৃতদেহটা শত্রুর হাতে না পড়ে। মরেও আমি বন্দী হতে চাই না।"

রাজার মুখে এই কথা শুনে সৈনিক সেনাপতি কেউ আর রণক্ষেত্রে রইল না। ঝুপঝুপ করে সবাই লাফিয়ে পড়ল গঙ্গার স্রোতে। তাদের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে রুচিতে বাধল ঈশ্বরীবর্মণের। তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন, ওদের পালাবার পথ ছেড়ে দিয়ে। তারপর, গঙ্গাতীরে যখন একটিও আর জীবিত মৌখরী অবশিষ্ট নেই, তখন ধীর পদে অগ্রসর হলেন নদীর দিকে। গৌড়িয়ারা তখন কাছেই এসে পড়েছে।

আর দুটো পদক্ষেপ বাকী ছিল, এমন সময় চোখে আঁধার দেখলেন ঈশ্বরীবর্মণ। পা টলে উঠল। হাতের কুঠার হাতেই ছিল তখনও, তারই উপর ভর দিয়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, পা বাড়াবার চেষ্টাও করলেন জলের দিকে। কিন্তু কোনটাই আর পেরে উঠলেন না তিনি। জলধারার দুই হাত উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

জ্ঞান যখন হল, তখন তিনি সুরম্য শিবিরকক্ষে সুকোমল রাজশয্যায় শুয়ে আছেন। কে একজন তাঁর মাথার কাছ থেকে বলে উঠল—"সম্রাটের জ্ঞান হয়েছে, জ্ঞান হয়েছে সম্রাটের।"

পার্শ্বকক্ষ থেকে কে একজন ছুটে এলেন। চিনি-চিনি মনে হল ঈশ্বরীবর্মণের। মাথার ঘোলাটে ভাবটা তখনও কাটে নি বলেই পারলেন না চিনতে। তিনি আবার চোখ বুজলেন। আবার ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে তিনি শুনলেন যেন কে একজন বলছে —"আঃ, হয়েছে জ্ঞান? ভগবান রক্ষা করেছেন। সম্রাটের মৃত্যু হলে অপূরণীয় ক্ষতি হত সারা দেশের।"

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ঈশ্বরীবর্মণ ভাবলেন—লোকগুলো তাঁকে ঠাট্টা করছে। সম্রাট পদবী তিনি কোন দিন নেন নি। নেবার বাসনা অবশ্য মনে মনে ছিল, কিন্তু সে-বাসনার কথা প্রকাশও করেন নি কারও কাছে। এরা নিছক অপমানই করতে চাইছে তাঁকে, এদের রাজ্যের একটা অংশ তিনি গ্রাস করতে চেয়েছিলেন বলে।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ভাগ্যকে অভিশাপ দিলেন ঈশ্বরীবর্মণ। রণজয়ের সৌভাগ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে বলে নয়, মৃত্যুরূপ মুক্তি থেকে বঞ্চিত করে তাঁকে বন্দী জীবনের লাঞ্ছনার ভিতর নিক্ষেপ করেছে বলে। কিন্তু এর চেয়ে বড় ভুল ঈশ্বরীবর্মণ এর আগে কখনও করেন নি। বুঝতে পারলেন সে কথা আরও দিন দুই পরে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর।

ভিষক ক্ষতমুখ সব বেঁধে দিয়েছেন, ঘা সব শুকিয়ে উঠেছে। শিবিরের ভিতরে বসে গবাক্ষপথে অদূর-প্রবাহিনী গঙ্গাস্রোতের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। ঐ প্রবাহে ভেসে গিয়েছে তাঁর অর্ধ-অক্ষৌহিণী সেনা, ভারতে অতুলনীয় অশ্বারোহীবাহিনী। মৌখরী ক্ষত্রিয়ের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তিনি একা কেন বেঁচে রইলেন বন্দীর জীবন যাপন করবার জন্য ?

হাতে-পায়ে শৃঙ্খল নেই, ধারে কাছে সশস্ত্র প্রহরীও নেই, তা ঠিক। তবু বন্দী ছাড়া তিনি আর কী ? রাজা সমাচারদেব একবারও দেখা করেন নি তাঁর সঙ্গে। ভিষক যা বলছেন, তা যদি সত্য হয়! রাজা নাকি গোড়ার দিকে অষ্টপ্রহর ঈশ্বরীবর্মণের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর অজ্ঞান অবস্থায়। একবার যেন সমাচারদেবের কণ্ঠস্বরও শুনেছিলেন তিনি। কিন্তু সেটা মনের ভুলও হতে পারে। দেখা হওয়া যে বড়ই দরকার! নিজের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে কী আকার নেবে, তা ত এখন ঈশ্বরীবর্মণ জানেনই।

দেখা অবশেষে হল। সমাচারদেব ঈশ্বরীবর্মণের মত শালপ্রাংশু পুরুষ নন। মাঝারিরকম লম্বা, একহারা চেহারার মানুষটি। আকৃতির মধ্যে লক্ষণীয় শুধু বিশাল দুটি চোখ, তা থেকে করুণা আর বিশ্বপ্রেম উছলে পড়ছে যেন। এমন লোক নির্মম যোদ্ধা হয় কেমন করে ? রক্ত দেখলেই তো এর কেঁদে ফেলবার কথা!

আশ্চর্য! রাজা সমাচারদেব এসেই নত হয়ে অভিবাদন করলেন মৌখরীরাজকে —"সম্রাটের জয় হোক"—

—"এ কী পরিহাস রাজা ?"—বিষণ্ণ বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঈশ্বরীবর্মণ—"আমি পরাজিত, বন্দী—"

"পরাজিত বটে, কিন্তু বন্দী নন"—বললেন সমাচারদেব—"যুদ্ধে শক্তিক্ষয় হয়েছে আপনারও আমারও। সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের অনেকগুলি বীরসন্তান বীরগতি লাভ করেছে। কিন্তু সে ক্ষতির পূরণ দুই দিনেই হবে। হারানো শক্তি কনৌজও ফিরে পাবে, ফিরে পাবে গৌড়বঙ্গও। পাওয়া দরকার, এবং পাওয়ার পরে সেই উভয় শক্তিকে একত্র সংহত করাও দরকার। তা নইলে হানাদার হুনকে কে রুখবে উত্তর ভারতে ?"

"হুন ?"—অবাক্ হয়ে ঈশ্বরীবর্মণ ভাবছেন—গঙ্গাপদ্মার জলবেষ্টনের নিরাপত্তায় বসেও এই বাঙ্গালী রাজা উত্তর ভারতের হুন-আতঙ্কের কথা ভাবছেন ? আশ্চর্য ত ! এতখানি সর্বভারতীয় দৃষ্টি ত অন্য কোন প্রাদেশিক রাজার তিনি দেখেন নি !

—"এ কী পরিহাস রাজা ?" [পৃষ্ঠা ৪৭৬

সমাচারদেব বললেন—"আমার কথাটা উপলব্ধি করুন সম্রাট ! আপনি অনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাট বলে স্বীকৃতি লাভ করেন নি। আমার কাছ থেকেও না, অন্য কোন রাজার কাছ থেকেও না। কিন্তু মনে মনে আমি অনেক দিন আগে থেকেই স্থির করে রেখেছি—সমগ্র উত্তরাপথের উপরে আপনাকে আমরা করব সম্রাট। দাক্ষিণাত্যকে সে-ঐক্যবন্ধনের ভিতরে এখনই নিয়ে আসার কোন উপায় দেখি না, তাই আর্যাবর্তের সম্রাট বলে আমি চিন্তা করেছি আপনাকে। তাই আপনাকে রাজকর দিতে দ্বিধা করি নি। নইলে, যুদ্ধ তো আমরাও করতে জানি ! জানি, কিন্তু করতে চাই না আপনার সঙ্গে যুদ্ধ। উত্তর ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাকে সম্রাট বলে মানতে চাই বলেই। তবে প্রশ্ন তুলতে পারেন—এবারে তাহলে আপনার সৈন্যক্ষয় করলাম কেন এভাবে ? করতে বাধ্য হয়েছি, আপনি আমার রাজ্যাংশ গ্রাস করতে চেয়েছিলেন বলে। ওটাতে আমরা রাজী হতে পারি না। সব রাজ্য নিজের নিজের চতুঃসীমার মধ্যে থাকবে স্বরাট। সম্রাটকে মানবে শুধু বহিঃশত্রুকে রুখবার বেলায়। কেন্দ্রীয় শাসন কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, তার ভূমিও করবে না আত্মসাৎ। আপনার সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক স্থাপনই আমার বাসনা।"

ঈশ্বরীবর্মণ রাজার ঔদার্যে বেশী মুগ্ধ, না তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত, তা বুঝতেই পারেন না। সমাচারদেবের ইচ্ছামত সন্ধিই রচিত হল আবার। ঈশ্বরীবর্মণ সসম্মানে ফিরে গেলেন নিজ রাজ্যে, নানাভাবে গড়তে শুরু করলেন

প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন। সমাচারদেব হয়ে উঠলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। পাঁচ বৎসরের ভিতর শতদ্রু থেকে দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে বাইশজন নরপতি সম্রাট বলে মেনে নিলেন ঈশ্বরীবর্মণকে। দুর্জয় শক্তির অধিকারী হল তাঁর সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্যের সেই শক্তি সমাচারদেবেরও উপকারে এল একদিন। তিনিই বীজ পুঁতেছিলেন। সেই বীজ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিশাল মহীরুহ যেদিন আকাশ চুম্বন করল, সেদিন তার ছায়ায় এসে আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন সমাচারদেবেরই হল একদা। তিব্বতরাজ প্রক্‌সাম কাম্পো আক্রমণ করলেন গৌড়বঙ্গের উত্তরাংশ। সম্রাটকে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ে সমাচারদেব ধাবিত হলেন তিব্বতী আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে মৌখরীর বিরাট বাহিনী নিয়ে ঈশ্বরীবর্মণ অগ্রসর হলেন বহিঃশত্রু বিতাড়নের জন্য।

রণজয়ী ঈশ্বরীবর্মণ আর সমাচারদেব যখন আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন রক্ত-পিছল ত্রি-স্রোতা উপত্যকার মাঝখানে, তখন সমাচারদেব হেসে বললেন—"এই জন্যই আমি চেয়েছিলাম সারা উত্তর ভারতকে এক মহাসাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করতে।"

এক অদ্ভুত জীব

এ এক অদ্ভুত জীব। বল ত দেখি আমাদের পৃথিবীর কি কি প্রাণীর অংশ এর দেহে আছে?

না পার ত ৪৮২ পৃষ্ঠায় দেখ।

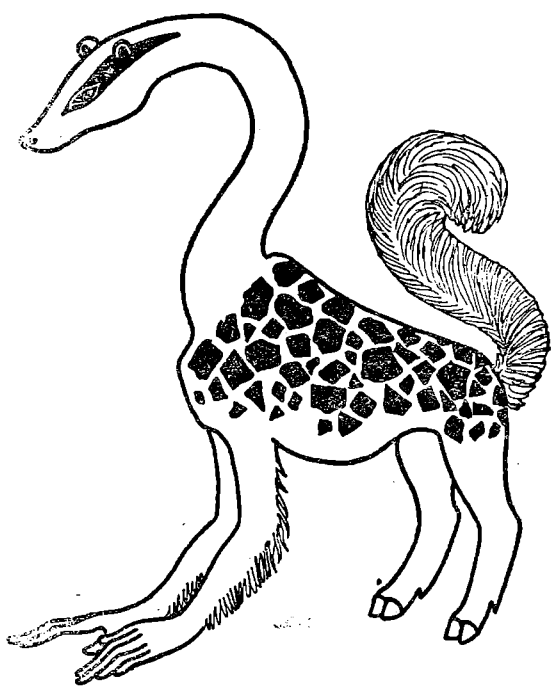

রহস্যময় জাহাজ

চিত্তরঞ্জন রায়

ইং ১৯৪৪ সাল। যুদ্ধের আগুন তখন পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ে একদিন একটি আমেরিকান মালবাহী জাহাজ আটলান্টা ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছিল গন্তব্যের দিকে। সমুদ্রের বুকে অসংখ্য মাইন পাতা। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। জাহাজের ক্যাপ্টেন কার্ট ডগলাস বিষণ্ণ মনে ডেকের উপর এসে দাঁড়ান। সমুখে সুদূর বিস্তৃত ফেনিল জলরাশি। উপরে সীমাহীন নীল আকাশ। জলের উপর তারই ছায়া। ডেকের ধারে রেলিং-এর উপর হাত রেখে ক্যাপ্টেন দূরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। একটা গাং-চিল মাঝে মাঝে উঠে এসে ক্যাপ্টেনের চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করে দেয়। ক্যাপ্টেন বিরক্তি-ভরা দৃষ্টি নিয়ে গাং-চিলটার দিকে তাকান। পাখীটা সমুদ্রের প্রায় বুক ছুঁয়ে খাদ্যান্বেষণে উড়ে চলে খানিকটা। তারপর ক্লান্ত হয়ে একসময় আবার ফিরে এসে ডেকের রেলিংএর উপর বসে। ক্যাপ্টেন মনে মনে বিরক্ত হলেও পাখীটাকে মারতে পারেন না। সমুদ্রযাত্রায় এসে কোন সামুদ্রিক পাখীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। এ নিয়ম সকল নাবিকই মেনে চলে। তাদের ধারণা কোন সামুদ্রিক পাখীকে হত্যা করলে সমুদ্র দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের অভিশাপ দেবেন—জাহাজে নেমে আসবে বিপদের কালো ছায়া।

কার্ট ডগলাস তাই গাং-চিলকে আর বিরক্ত করতে চাইলেন না। হঠাৎ তিনি ঝুঁকে পড়েন রেলিং ধরে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন কি যেন বস্তু একটা সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আরও একটু সজাগ হয়ে উঠল। জিনিসটা তখনও ঢেউএর তালে তালে নাচতে থাকে। এবার তার দুই চক্ষু বিস্ময়ে ভরে উঠে। ক্যাপ্টেন দড়ি বেঁধে একটা বালতি নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের বুক থেকে একটা ছোট্ট টিনের কৌটা তুলে আনেন। সামান্য একটা টিনের কৌটা মাত্র। ঢাকনাটা শক্ত ভাবে আঁটা। ক্যাপ্টেন প্রাণপণ শক্তিতে কৌটাটা খুলে ফেলেন। কৌটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক। ক্যাপ্টেন মোড়কটা খুলে ফেলে চোখের সামনে মেলে ধরেন।

একটা ছোট্ট চিঠি—মাল্টা বিপদগ্রস্ত—আমাদের উদ্ধার করুন। চিঠির নীচে ছোট্ট একটা স্বাক্ষর। ভাল করে পড়া যায় না।

মাল্টা নামটা পড়েই ক্যাপ্টেনের সব চিন্তা গুলিয়ে যায়। মাল্টা—হ্যাঁ মাল্টা

ডগলাস চোখের উপর তুলে নেন দূরবীনটা। [পৃষ্ঠা ৪৮২

নামক একটা জাহাজ ছিল বৈ কি। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগের কথা। ডগলাস তখন মেরিন কলেজের ছাত্র। একদিন হঠাৎ সংবাদপত্রে একটা ছোট্ট সংবাদ দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। আটলান্টিকের বুক থেকে যাত্রী বোঝাই মাল্টা অদৃশ্য। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাল্টার কোন হদিস না পেয়ে অনেকেই ভেবে নিয়েছিলেন মাল্টা হয়তো সমুদ্রের বুকে কোন চোরা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চিরদিনের জন্য সমুদ্রের অতলে হারিয়ে গেছে। কালক্রমে একদিন মাল্টার কথা সবাই প্রায় ভুলে গেল। ডগলাসের স্মৃতি থেকে সে সব কথা একেবারেই মুছে গিয়েছিল। কিন্তু চিঠিটা পড়ে দীর্ঘদিন পরে আবার তাঁর সেই সব পুরানো স্মৃতি মনের মধ্যে এক এক করে জেগে উঠে।

ক্যাপ্টেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার কয়েক চিঠিটা পড়েন। কিন্তু একটা কথা ছাড়া আর কিছু তার কাছে স্পষ্ট হয় না। মাল্টা বিপদগ্রস্ত। তাহলে নিশ্চয়ই ঐ বিপদের কথা এস ও এস করে অন্যান্য জাহাজকে জানানো হয়েছিল? কিন্তু তেমন কোন সংবাদ আজো কোন জাহাজের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

ডগলাস ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে চিন্তার জাল বুনে চলেন একভাবে। কিন্তু তিনি যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত! আটলাণ্টা নির্বিঘ্নে জল কেটে এগিয়ে চলে।

সন্ধ্যা আসন্ন। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া একে একে সমুদ্রের বুকে নেমে আসে। জাহাজের লাইটগুলো একে একে জ্বলে ওঠে। সমুদ্রের উষ্ণ বাতাসের ঝাপটায় ক্যাপ্টেনের টুপিটা কপালের একপাশে কাৎ হয়ে যায়। টুপিটা ঠিক করতে করতে ক্যাপ্টেন হঠাৎ চমকে ওঠেন। দূরে—বহুদূরে একটা উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যায় যেন।

ডগলাস দূরবীনটা চোখের উপর তুলে নেন মুহূর্তের মধ্যে। আবছা অন্ধকারে একটা জাহাজ দূরবীনের লেন্সের উপর ভেসে ওঠে। ধীরে ধীরে ওটা যেন আটলান্টার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জাহাজটার দিকে। জাহাজটা আরো, আ-র-ও কাছে এগিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে লেন্সটা মুছে নিয়ে আবার চোখের উপর তুলে নেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। জাহাজটা আর দেখা যায় না। শুধু একটা আলোর রেখা যেন জলের উপর দুলতে দুলতে অগ্রসর হতে থাকে ধীরে ধীরে।

রেডিও অফিসার হন্তদন্ত হয়ে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে। [পৃষ্ঠা ৪৮২

আগন্তুক জাহাজটাকে লক্ষ্য করে আটলান্টার থেকে তীব্র সার্চ লাইট ফেলা হয়। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় আটলান্টার অনতিদূরে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাহাজের দেহে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—মান্টা।

ক্যাপ্টেন কার্ট ডগলাস বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। তিনি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছেন নাকি? বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর কার্ট ডগলাস ভাল করে তাকিয়ে দেখেন আরো একবার। কিন্তু বিস্মিত ক্যাপ্টেন দেখলেন আটলান্টার সমুখে সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি টলতে টলতে কেবিনে এসে প্রবেশ করেন। মুহূর্ত কয়েক বিশ্রাম নিয়ে নিজের ডায়রীটা খুলে নিয়ে লিখতে বসেন—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার একটা আজ আমার চোখে পড়ল। বিস্মৃতপ্রায় হারিয়ে যাওয়া জাহাজ মান্টার, দীর্ঘদিন পরে আবার সাক্ষাৎ মিলল। কিন্তু…

ডায়রীর পাতায় আরও কি যেন লিখতে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন, এমন সময় হঠাৎ রেডিও অফিসার হন্তদন্ত হয়ে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে বলল—মাল্টা এস ও এস পাঠাচ্ছে। ক্যাপ্টেন ডায়রী ফেলে তীব্র উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন।

—বল কি হে? এস ও এস পাঠাচ্ছে মাল্টা?

—হ্যাঁ স্যার।

ক্যাপ্টেন উত্তেজিত হয়ে ছুটে চলেন ইঞ্জিন ঘরের দিকে।

—জাহাজের গতি বাড়িয়ে দাও আরো কয়েক নট বেশী। ইঞ্জিন ঘরের সকলেই বিস্মিত হয়ে যায় ক্যাপ্টেনের নির্দেশে। যাই হোক জাহাজ তীব্র বেগে ছুটে চলে উত্তরমুখো। ক্যাপ্টেন পুনর্বার ডেকে এসে দাঁড়ান। দৃষ্টি তাঁর সাগরের দিকে। নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন এক সময় ভোর হয়ে আসে, ক্যাপ্টেন মোটেই বুঝতে পারেন না। এমন কি রেডিও অফিসার যে কখন নিঃশব্দে তাঁর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে তাও তিনি টের পান না।

—জলো হাওয়ায় বেশীক্ষণ দাঁড়াবেন না ক্যাপ্টেন। রেডিও অফিসারের কণ্ঠে তার সম্বিৎ ফিরে আসে।

—হ্যাঁ চলো, এবার ভেতরে যাওয়া যাক। কিন্তু মাল্টা?

—মরীচিকা—সবই মরীচিকা ক্যাপ্টেন। মরুভূমির মত সমুদ্রেও যে মানুষ মরীচিকা দেখে তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।

—তা না হয় জানলাম কিন্তু তোমার এস ও এস এটাও কি মরীচিকার আওতায় পড়ে।

ক্যাপ্টেনের প্রশ্নে জুনিয়ার রেডিও অফিসার বিব্রত বোধ করেন। মাল্টার এস ও এস তো ও নিজের কানে শুনেছে। এ তো আর মরীচিকা হতে পারে না। তাহলে?

ক্যাপ্টেন চিন্তিত, রেডিও অফিসারের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন—cheer up young man. জীবনে এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যার কোন কারণ প্রদর্শন করা যায় না।

---

৪৭৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১। ব্যাজারের মাথা
২। রাজহাঁসের গলা
৩। জিরাপের গা
৪। বাঁদরের হাত
৫। শুয়োরের পেছনের পা দুটি
৬। কাঠবিড়ালীর লেজ।

● বিদেশী গল্প

শেষ রাতের অতিথি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

রাতটা এমন বিশ্রী সেদিন! বরফ পড়ছে ত পড়ছেই। হাওয়া যেখানে চামড়ায় লাগছে, সূঁচের মতন বিঁধে যাচ্ছে সেখানে। এক বালতি জল ছিল, বরফের সর পড়েছে তার উপরে। সকালে উঠে জলের বদলে বরফ দিয়ে বোধ হয় মুখ ধুতে হবে ডম নিকোলাসকে।

প্যারি শহরের এই পাড়াটায় গরিবদেরই বাস। সেণ্ট জনের কবরখানার গায়ে গায়ে তাদের পাথর-ছাওয়া চালা ঘর। নিকোলাসের চালাখানা আবার একেবারেই নিঃসঙ্গ, পুবে পুবদিকটাতে ওর পড়শী নেই একটিও।

রাত অনেক হয়েছে। ধারে কাছে কোন ঘরে আলো জ্বলছে না। এক এই নিকোলাসের ঘর ছাড়া। দোর জানালা বন্ধ করে আগুনের ধারে বসে আছে ডম নিকোলাস। ফুলো-ফুলো লালচে মুখখানার উপর আলো-ছায়ার চলেছে ভুতুড়ে নাচ পালা করে করে।

ডম নিকোলাস নাকি পাদরী ছিল কবে, সুযোগ পেলেই সে লাটিন আওড়ায় বন্ধুমহলে। ভুল ধরবার ক্ষমতা সে-মহলে একমাত্র ভিলন ছোকরারই আছে, সে নাকি প্যারি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ. পাস। ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু ভুল সে ধরে না। কোন মুখে ধরবে? কবিতার মিল খোঁজার ব্যাপারে এক এক সময় সে দামী সাহায্য পায় নিকোলাসের কাছে। ফ্রান্সিস ভিলন শুধু যে এম-এ একজন, তা নয়, সে কবিও।

ঠিক এই মুহূর্তেই নিকোলাসের পিঠের কাছে বসে ভিলন কবিতাই লিখছে। "মাছ ভাজার ছড়া" কবিতাটার নাম। দুই লাইন সে লিখে ফেলেছে—

"যে-মাছ ছিল সমুদ্দুরের গভীরে,
ভেজে ভেজে খেতে দেয় তা রাঁধুনীরা ধনীরে—"

লিখে ফেলেই সে ঘাড় বাঁকিয়ে নিকোলাসকে বলছে—"নিক রে, বল ত কেমন শোনাচ্ছে? 'যে মাছ ছিল সমুদ্দুরের গভীরে, ভেজে ভেজে খেতে দেয় তা রাঁধুনীরা ধনীরে' কেমন শোনাচ্ছে—বল—"

বয়েস নিকোলাসের প্রায় আড়াই গুণ হবে ভিলনের, তবু তুই-তোকারি করতে এক তিলও বাধে না তার। সমবয়সীর চাইতে সহমর্মীই মানুষকে কাছে টানে বেশী।

নিকোলাস বলল—"তা মন্দ শোনাচ্ছে না। তেশরা লাইনে লেখ—'স্যামন মাছের ভাজা, যে খায় সেই ত রাজা'—"

"বাঃ বেশ বেশ!"—ভিলন চচ্চড় করে লাইনটা লিখে ফেলল—স্যামন মাছের ভাজা, যে খায় সেই ত রাজা, সেণ্ট ডেনিসের ফাঁসি কাঠে পায় সে উচিত সাজা—"

"সেণ্ট ডেনিসের ফাঁসি কাঠে?" নিকোলাস চটে উঠল—"মাছ ভাজা খেলেই ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে? কত কত জায়গায় মানুষ খুন করেও ফাঁসিকে ফাঁকি দিলাম, আর এখন মাছভাজা খেতে গিয়ে ফাঁসি যাব? কী যা-তা লিখছিস তুই আজকাল, অ্যাঁ?"

ভিলন তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে—"আরে, লিখেছি বলেই কি আর ফাঁসি যাচ্ছি আমরা? মিলের খাতিরে ও রকম লিখতে হয়। ভাজা রাজা—এসবের সঙ্গে 'সাজা' ছাড়া আর কী দিয়ে তুই মেলাবি শুনি?"

তার পরই সে পুরো চারটে লাইনই একসাথে পড়ে গেল গড়গড় করে, বেশ অঙ্গভঙ্গী করে আবৃত্তি, যেমনটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কখনো কখনো সে করেছে—

"যে-মাছ ছিল সমুদ্দুরের গভীরে,
ভেজে ভেজে খেতে দেয় তা রাঁধুনীরা ধনীরে।
স্যামন মাছের ভাজা, যে খায় সেই ত রাজা,
সেণ্ট ডেনিসের ফাঁসি কাঠে পায় সে উচিত সাজা—"

পড়ার পরে নিজে নিজেই মাথা নাড়ল ভিলন—"কথার মিল হয়েছে বটে, মানের মিল হয় নি। শেষ লাইনটা বেখাপ্পা লাগছে বড্ডো—"

একটা চিৎকার হঠাৎ, ওদিককার কোণ থেকে।

থিভেনিন আর মর্ল্টিনি জুয়া খেলছিল, ট্যাবারি ছিল পাশে বসে। হঠাৎ থিভেনিনকে ছুরি মেরেছে মর্ল্টিনি। মোক্ষম এক ঘা একেবারে গলায়। একটার বেশী আর চিৎকার দেয় নি থিভেনিন, চেয়ারেতেই কাৎ হয়ে পড়েছে।

জুয়াতে ক্রমাগতই জিতছিল থিভেনিন, মর্ল্টিনি হেরেই যাচ্ছিল বাজির পর বাজি। রাগ ধোঁয়াচ্ছিল এতক্ষণ, এইবার দপ করে জ্বলে উঠেছে।

সবাই একলাফে উঠে দাঁড়াল, ঘিরে দাঁড়াল থিভেনিনকে। মরে গিয়েছে লোকটা।

ভিলনের অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল তারই সদ্যোরচিত কবিতার শেষ লাইন—"সেণ্ট ডেনিসের ফাঁসি কাঠে পায় সে উচিত সাজা—"

নিকোলাস খিঁচিয়ে উঠল তাকে—"ফাঁসির সাজা থেকে কেউ নিস্তার পাবে না, দেখে নিস—"

মর্ল্টিনি বলল—"সে যা হবার, তা হবে—"

বলতে বলতেই থিভেনিনের পকেট থেকে টাকার থলেটা টেনে বার করল মর্লিনি, টেবিলের উপর সেটা উবুড় করে একরাশ মুদ্রা বার করল তা থেকে। শুধু জুয়াতেই সে লাভ করেছিল থিভেনিন আজ, তা নয়, দিনের বেলায় মোটা রকম একটা পকেটও মেরেছে।

অর্থটা সমান চার ভাগে ভাগ করে ফেলল মর্লিনি। তার বন্ধুরা কেউ আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রইল না, এক একজনে এক এক ভাগ তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরল।

ভিলন ব্যাগটা পকেটে ভরেছে সবে, মর্লিনি ওদিকে ছোরাটা টেনে বার করেছে থিভেনিনের গলা থেকে। ছোরার সঙ্গে সঙ্গে কিনকি দিয়ে রক্ত বেরুলো, লেগে গেল মর্লিনির হাতে। ভিলন পাশেই দাঁড়িয়েছিল ই করে, মর্লিনি তার কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে দিল। ঠেলে দেওয়ার কোন দরকারই ছিল না। ভিলনের কাঁধে নিজের হাতের রক্ত খানিকটা মাখিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য।

হঠাৎ থিভেনিনকে ছুরি মেরেছে মর্লিনি।
[পৃষ্ঠা ৪৮৪

ঠেলা খেয়ে ভিলন গিয়ে সেই টুলটার উপরেই বসে পড়ল, যেখানে বসে তিন মিনিট আগে সে মাছ ভাজার ছড়া লিখছিল। খুনখারাপি আগে সে দেখে নি, তা নয়, কিন্তু আপনা-আপনির ভিতর এবং অকারণে এই যে খুনটা হয়ে গেল, এর কোন মানে সে খুঁজে পাচ্ছে না। কেমন যেন গা গুলোচ্ছে তার। বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে।

নিকোলাস এসে কাঁধে হাত রাখল তার। ভিলন ভাবল—বন্ধু সাহস দিতে চাইছে তাকে। কৃতজ্ঞতার ঝোঁকে সে নিকোলাসের হাতটা ধরে চাপ দিল।

হায় কৃতজ্ঞতা! নিকোলাসের অন্য হাত ততক্ষণে ভিলনের পকেট থেকে ব্যাগটি তুলে নিয়েছে। ভিলন তা টের পায় নি, কিন্তু টের পেয়েছে মর্লিনি আর ট্যাবারি। তারা ইশারায় বখরা চাইছে নিকোলাসের কাছে, নিকোলাসও ঘাড় নেড়ে ইশারা করছে—"দেব।"

পাঁচ মিনিট বাদেই ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সবাই। নিকোলাস এক টিন পেট্রোল টেনে তুলেছিল মেজের ভিতরকার এক গর্ত থেকে, সেই পেট্রোল ঢেলে দেওয়া

হয়েছে মৃতদেহটার সর্বাঙ্গে এবং সারা ঘরের সর্বত্র। তারপর ঘরে আগুন লাগিয়ে তালা দিয়েছে বন্ধ করে। পুড়ুক!

ঘর থেকে বেরিয়ে চারজন চারদিকে হাঁটল। দল বেঁধে গেলে পুলিসের নজরে পড়ার ভয় বেশী। একা গেলেও যে ভয় নেই, তা নয়। তবে একার পক্ষে লুকোনো সোজা, চারজন এক সাথে গা ঢাকা দেবার মত জায়গা সর্বত্র মেলে না।

বরফ আর ঝরছে না। ভিলন বড় দুঃখে হেসে ফেলল। পালাচ্ছে বটে ত। কিন্তু ঐ পোড়া ঘরখানার সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতিহাস, রাস্তার জমানো বরফের বুকে জাজ্বল্যমান হয়ে লেখা রইল পদচিহ্নের হরপে। পুলিস যখনই রোঁদে আসুক এই প্রকাণ্ড রাতটার ভিতর, পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই ভিলনকে ধরে ফেলবে, সে ততক্ষণে শহরের অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেলেও।

ঐ না একদল পুলিস যায়? আলো হাতে নিয়ে?

ওরা যতক্ষণ দৃষ্টির বাইরে না গেল, ভিলন রইল একটা বাড়ির দেয়ালে লেপটে। তারপর সে গিয়ে হাঁটতে লাগল পুলিস দলের পদচিহ্নের উপরে পা ফেলে ফেলে। একশো গজের মত রাস্তা এইভাবে চলবার পরে সে তখন সাহস পায় অন্য রাস্তা ধরবার। পদচিহ্নের বাঁধন সে কাটাতে পেরেছে।

এইবার কিছু খেতে ত হয়। নিকোলাসের কুঁড়েতেই যা হোক কিছু খেয়ে ওখানেই রাত কাটাবার যে মতলবটা সে সন্ধ্যাবেলায় করেছিল, তা ত ভেস্তে গিয়েছে মর্টিনির হঠকারিতায়। আর আধঘণ্টা পরে যদি খুনটা হত, ততক্ষণে পেটে কিছু পড়ত সবাইয়ের। হল না তা। বরাতে না থাকলে নিশ্চিত জিনিসও ফসকে যায় এইরকম। খুনের পর খাওয়ার কথা আর মাথাতেই ছিল না কারও।

এখন কিন্তু কিছু না খেলে আর চলে না। রাত একটা বোধহয়। এখনও হোটেল খোলা আছে দেদার। খেতে হবে, একটা বিছানাও ভাড়া নিতে হবে রাতটার মত। ভাগ্যিস পকেটে পয়সা আছে আজ! থিভেনিনের টাকার চার ভাগের এক ভাগ। লুইয়ে, সেণ্টে, হোয়াইটে মিলে কম অর্থ নয়!

অর্থের কথা ভাবতে ভাবতে স্বভাবতঃই পকেটে হাত ঢোকাল ভিলন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে চমকে উঠল। কোথায়? কোথায় গেল ব্যাগ? এ-পকেট, সে-পকেট—যাঃ, কোথাও নেই। টাকার ব্যাগ লোপাট। রাস্তায় পড়ে গেল? তা ছাড়া আর কী হতে পারে?

একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল ভিলন। সেণ্ট জনের কবরখানার দিকে ছুটল সে আবার। যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই ছুটল। ডম নিকোলাসের ঘর পর্যন্তই এল রাস্তার প্রতি ইঞ্চি পরখ করতে করতে। নাঃ, নেই কোথাও। নেই সে ব্যাগ। নিশ্চয়ই

পথচর কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে। চোরের ধন বাটপাড়ে নিয়েছে। অতি দুঃখে হেসে ফেলল ভিলন।

ঐ নিকোলাসের ঘর। দরজা পুড়ে গিয়েছে। ভিতরে এখনো আগুনের হলকা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। কবাটশূন্য দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। কী আশ্চর্য! পুলিস এখনও আসে নি? থিভেনিনটা কি পুড়ে শেষ হয়েছে এতক্ষণে? যাক, ফাঁসিতে মরার চাইতে ভালই মরেছে লোকটা। ফাঁসি একটা কেলেঙ্কারী। যন্ত্রণার কথা বাদই দাও, হাজার লোক এসে হাঁ করে দেখবে তার ছটফটানি। মরার পরেও দেখবে হাওয়ায় হাওয়ায় কখনো জোরে, কখনো ধীরে অবিশ্রান্ত দোলানি। সত্যিই বড় লজ্জার ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা এম. এ. সে। তাকে যদি সে-লজ্জায় কখনও পড়তে হয়, তার চাইতে ভিলনের মরে যাওয়াই ভাল।

বরফ আবার পড়ছে। এরই মধ্যেই তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে আশ্রয়ের সন্ধানে। নিকোলাসের ঘরের আগুনটা যদি নিভত, ঐখানেই সে ঢুকে পড়ত, ভূতের ভয় অগ্রাহ্য করে। তা যখন হবার নয়, ধর্মপিতা পাদরী আন্‌শ্লেমের কাছে একবার ধর্না দিলে হয়। দেবে না ঢুকতে, আগেও কয়েকবার কুকুর তাড়া করেছে এইরকম পরিস্থিতিতেই। দ্রুত পা চালিয়ে সেই দিকেই তবু চলল ভিলন।

যা ভেবেছিল তাই। দরজা খুলল না পাদরী। সাহসই পেল না বোধ হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস আশ্রয় দিলেই ভিলন তাকে খুন করে পয়সা-কড়ি নিয়ে পালাবে।

তারপর সে গেল বন্ধু হেনরিকের বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনে অকৃত্রিম বন্ধু ছিল সে। আরও অনেকে ছিল। তারা অনেকদিন আগেই মুখ দেখা বন্ধ করেছে ভিলনের। এই হেনরিটাই শুধু টিকে ছিল সে-দিন পর্যন্ত। শেষ যেদিন দেখা, অকারণে মাথা গরম করে অকথ্য গালি-গালাজ করল ভিলন। হেনরিক বলে দিল—"আর এসো না তুমি"—

যায় নি সত্যি। তারপর থেকে একদিনও যায় নি ভিলন। কিন্তু আজ?

আজ না গেলে নয়। আর কিছুক্ষণ এইভাবে মাথায় বরফ ঝরলে নির্ঘাৎ নিউ-মোনিয়া হবে। আড়ষ্ট হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে ও। যেতেই হবে।

গেল। কড়া নাড়ল। হেনরি এখনও পড়াশুনা করে অনেক রাত জেগে। উপর থেকেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল—"কে?"

ভিলন বলল—"বড় বিপদ ভাই! আমি ভিলন—"

হেনরিক জানালা থেকে সরে গেল। ভিলনও কী যেন ভেবে অনেকটা দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপরই এক বালতি নোংরা জল জানালা দিয়ে হুড়হুড় করে পড়ল ঠিক সেইখানটাতে, যেখানে একটু আগেও ভিলন দাঁড়িয়েছিল। যা ভেবেছিল ভিলন, তা ঠিকই।

এখন ভিলন করে কী? পেটের ভিতর চাঁ চাঁ করছে। গায়ের ভিতর কাঁপুনি যেটা ছিল এতক্ষণ সেটা আর টের পাচ্ছে না কিন্তু। অর্থাৎ অনুভূতি অসাড় হয়ে আসছে। মায়ের কথা মনে পড়ছে ভিলনের। আজ যদি মায়ের ঠিকানাটা জানা থাকত তার। দোরে গিয়ে দাঁড়ালে মা কখনও ফেরাত না তাকে। যদিও তার সাথে এ-যাবৎ যে ব্যবহার করেছে ভিলন, তা মানুষের ব্যবহার নয়।

হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি এল একটা। ইচ্ছে করে কেউ জায়গা দিচ্ছে না তাকে। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে, জানতে না দিয়ে যদি সে ঢোকে কোথাও? বাইরের ঘর খালি পড়ে থাকে রাত্রে। সন্ধ্যের অগ্নিকুণ্ডে দুই একখানা কাঠও জ্বলতে থাকে শেষ রাত পর্যন্ত। এই রকম একখানা ঘরে ঢুকে বাকী রাতটুকু আরাম কেদারায় গড়িয়ে নিলে কার কী ক্ষতি?

একটা বাড়ি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মস্ত বাড়ি। আলো জ্বলছে উপরের একটা মাত্র ঘরে। তা জ্বলুক। ওটা দোতলায়। ওখানে ভিলন কী করতে যাবে? সে একতলায় বাইরের ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে যদি—

বার দুই তিন বাড়িটার সামনে দিয়ে আনাগোনা করল সে। কোন্ জানালাটা সহজে খোলা যাবে, আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই।

হঠাৎই দরজাটা খুলে এক ভদ্রলোক সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন—"বাবা! তুমি ভিতরে এস। এই বরফে—এস, এস, ভয় নেই, ভিতরে এসে বস—"

ভিলন স্তম্ভিত। কিন্তু ভিলন ভয় পেয়ে পালাল না। পালালে মরণ নিশ্চিত, তা সে জানে। বাড়িতে ঢুকলে, আর যা-ই হোক, এক্ষুণি তো মরতে হচ্ছে না আর!

ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে ভিলন বাড়ির ভিতরে ঢুকল। তিনি তাকে দোতলায় নিয়ে তুললেন একেবারে, যেখানে আলো দেখেছিল ভিলন রাস্তা থেকে। আলো শুধু নয়, গনগনে আগুনও জ্বলছে ঘরে। আগুনের কাছেই চেয়ার টেনে দিয়ে ভদ্রলোক ওকে বসতে বললেন—"অনেকক্ষণ তুমি পায়চারি করছ রাস্তায়, আমি দেখেছি। বস। কিছু খাবার আনি তোমার জন্য। চাকরেরা ঘুমোলে আমি আর বিরক্ত করি না তাদের। নিজেই খাবার আনছি তোমার—"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আগুনের দিকে পা মেলে দিয়ে ভিলন ঘরখানার চারিদিকে চোখ বুলোতে লাগল। বিশেষ আসবাবপত্র নেই। দেয়ালে একটা বন্দুক রাখার র‍্যাক। গোটা দশেক বন্দুক তাতে। দেয়ালে ঝোলানো নানা আকারের তরোয়ালও খান দশেক। ভদ্রলোক যুদ্ধবিভাগের লোক নিশ্চয়। মানুষ মারা অভ্যাস আছে, মরার ভয়ও তাই নেই।

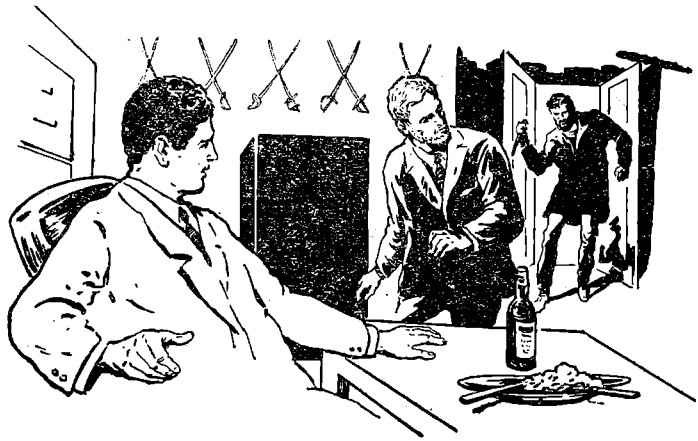

ছোরা হাতে নিয়ে নিকোলাস বৃদ্ধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। [পৃষ্ঠা ৪৯০

উনি এলেন এক ডিশ মাংস আর এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে। ভিলন গো-গ্রাসে খেতে শুরু করল। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ, লক্ষ্য করেছে ভিলন। কিন্তু কী সুন্দর চেহারা এখনও! মাথায় সাদা চুল যেন যীশু খ্রীষ্টের মাথার জ্যোতির মত। চোখের চাউনি যেন কত সমবেদনায় ভরা!

"তোমার কাঁধে রক্তের দাগ"—বললেন বৃদ্ধ—"নিজে আঘাত পাওনি তো? যদি পেয়ে থাক, আমি প্রাথমিক সাহায্য, ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ করতে জানি—"

"রক্ত?"—চমকে উঠে ভিলন কাঁধের দিকে তাকাল ঘাড় বাঁকিয়ে। মর্ল্টিনির রক্তমাখা হাতের দাগ। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি। এই রক্তের দাগ নিয়ে সে যদি কোন হোটেলে ঢুকত—কী সর্বনাশ! টাকা চুরি গিয়ে সে ফাঁসির হাত থেকে বেঁচেছে। "না আমি আহত হই নি, আর বিশ্বাস করুন আমি আজ অন্ততঃ আঘাত করিনি কাউকে, রক্তপাত হয়েছে বটে তবে আমার দ্বারা হয় নি—"

"আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাব কেন বাবা? সে তোমার ভাববার কথা, তোমারই বিবেকের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়ার কথা। আমি শুধু এইটুকুই বলব তোমায়, শোধরাবার দিন কখনও ফুরিয়ে যায় না।"

হঠাৎ দুনিয়াটা যেন বনবন করে ঘুরতে লাগল ভিলনের চোখের সামনে। ম্যাজিকের মত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পিছনে একটা ছায়া পড়ল কোথা থেকে। পরের মুহূর্তেই কায়া গ্রহণ করল সেই ছায়া। সে-কায়া নিকোলাসের, হাতে তার ছোরা, ছোরা হাতে নিয়ে সে বৃদ্ধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত—

"দেখুন! দেখুন! দেখুন!"—আর্তনাদ করে উঠল ভিলন।

"ভিলন! বেইমান!" বলে হিসহিস করে উঠল নিকোলাস, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে পড়ল বৃদ্ধের কাঁধে ছোরা বসিয়ে দেবার জন্য।

তারপর? একটা তালগোল পাকিয়ে গেল তিনটে মানুষে। ভদ্রলোক নীচে নিকোলাস উপরে, ভিলন তারও উপরে। ওদিক থেকে চাকরেরা ছুটে আসছে গোলমাল শুনে।

নিকোলাস অনেক আগেই বাড়িতে ঢুকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ভিলনকেও দৈবাৎ এখানে হাজির হতে দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ছিল একা, হল দু'জন। আর দেরি করার দরকার কী? সে কেমন করে বুঝবে যে ভিলন বুড়োটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে? বাঁচিয়েছে ভিলন ঠিকই, কিন্তু নিজে ধরা পড়েছে হত্যাকারীর সহকারী বলে। সেণ্ট ডেনিসের ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে এবার। *

* রবার্ট লুই স্টিভেনসন রচিত "এ নাইটস্ লজিং" অবলম্বনে।

কি আশ্চর্য

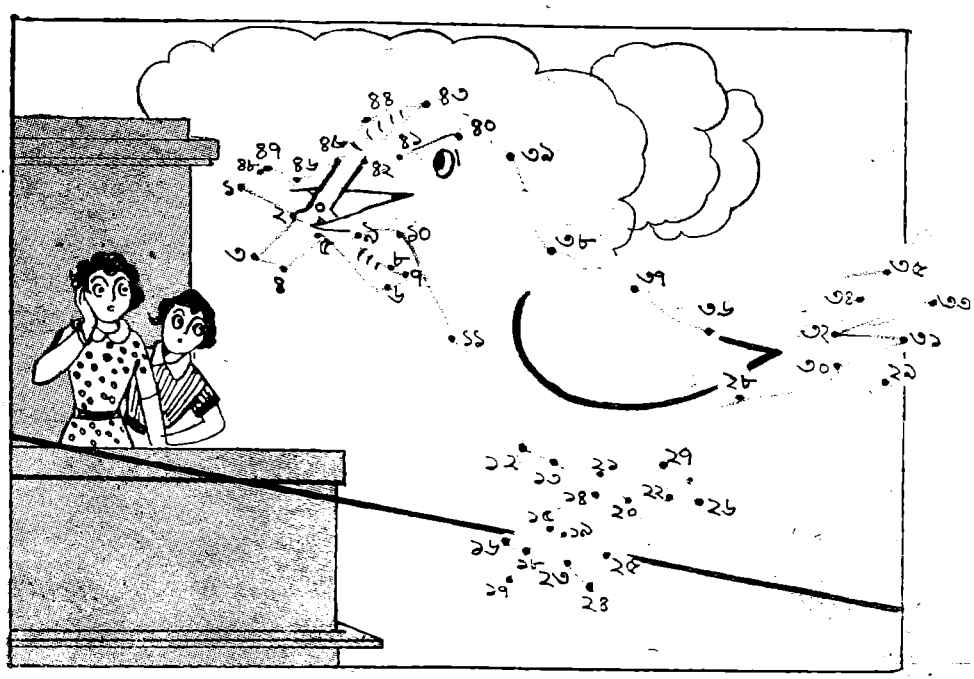

বল ত কে আছে এই ছবিতে। না পারলে ১ থেকে ৪৮ অবধি দাগ দাও।

ঘুম

পরিমলকুমার দে

বোলপুরের অজিতবাবুর মুখেই ঘটনাটা শুনেছিলাম। সত্যি ব্যাপার। নিছক গল্প নয়। আর সেটা ঘটেছিল অজিতবাবুকে কেন্দ্র করেই।

অজিতবাবু গ্রামের ছেলে। সাধা মাটা ভাল ছেলে। শহরের আদব কায়দা, কথায় কথায় ইংরেজী বলা, এ সব জানতো না। স্থানীয় স্কুল থেকে পাস করে বর্ধমানের একটা কলেজে পড়তে গেল।

এই সময়ে ঘটনাচক্রে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনার একটা সুযোগ অজিতবাবুর কাছে এল। কিন্তু বিলেতের নাম শুনেই ওর ভয় হল। অজানা অচেনা জায়গা। সাহেব-মেমদের দেশ। তাদের কথাই তো বুঝতে পারবে না। কি বলতে কি বলে ফেলবে। দরকার নেই গিয়ে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই এসে ওকে বোঝাতে লাগল—"এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? প্রথম প্রথম অসুবিধে হলেও পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।" বিলেত ফেরত দু'চারজন পরিচিত মানুষও এসে যখন উৎসাহ দিলেন তখন অজিতবাবু মন স্থির করে ফেলল—বিলেত যাবে।

অজিতবাবুর কপালটা ভাল। বিলেতে পৌঁছে একটা ভাল থাকবার জায়গা পেল। এক বিধবা মহিলার বাড়ি। একতলায় তিনি নিজে থাকেন। দোতলার একটি ঘর অজিতবাবু ভাড়া নিল।

ভদ্রমহিলার নাম মিসেস ডয়েগ। সংসারে আর কেউ নেই বললেই চলে। সারা দিন-রাত্রির সঙ্গী হোল একটা 'ড্যাস হাণ্ড' কুকুর। নাম তার 'ডিক'। রংটা বাদামী। গায়ে লোম নেই বেশী। দেড় হাত লম্বায়, পাগুলো ছোটো। কান দুটো গাল বেয়ে

নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। হেলে দুলে চলে। চলবার সময় মনে হয় বুকটা বুঝি মাটি ছুঁয়েছে। সাংঘাতিক তেজী কুকুর। ছুটতেও পারে খুব। বাড়ির ত্রিসীমানায় অপরিচিত কাউকে আসতে দেবে-না। নতুন কাউকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে যাবে। কিন্তু মিসেস ডয়েগ যদি চুপ করতে বলে ডিক সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে। যে কোন মানুষই মিসেস ডয়েগের কাছে বসে থাকলে ডিক একটু দূর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকবে। প্রভুকে সর্বক্ষণ পাহারা দেবে।

সকালে বিকেলে ডিক মিসেস ডয়েগের সঙ্গে বেড়াতে যায়। রাত্রি বেলায় মিসেস ডয়েগের খাটের পাশেই ছোট্ট একটা খাটে ওর শোবার ব্যবস্থা। কিন্তু রাত্রে ডিক ঘুমোয় কম। চুপচাপ শুয়ে থাকে। একটু শব্দ হলেই লাফিয়ে ওঠে।

অজিতবাবু যখন ঐ বাড়িতে প্রথম এল তখন প্রথম দু'চারদিন ডিকের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব ভাল ছিল না। অজিতবাবুকে দেখলেই ডিক চেঁচাতে শুরু করত। অজিতবাবু যে উপরের ঘরে এসে জুড়ে বসেছে, এটা যেন ডিক-এর পছন্দ নয়। মিসেস ডয়েগের অনেক চেষ্টায় কোন রকমে দুজনের সম্পর্কের উন্নতি হল। অজিতবাবু কুকুর পছন্দ করতেন না। তার ওপর ডিক-এর মতো কুকুর। বেশ ভয়ে ভয়েই দিন কাটত।

ডিক মহা চালাক। ও অজিতবাবুকে বুঝে ফেলেছে। আর সেই কারণেই যতটা সম্ভব অজিতবাবুকে রাগাবার চেষ্টা করত! জুতো লুকিয়ে ফেলত—খোলা মোজা দেখলেই নিয়ে পালাত। আসল কথা ডিক অজিতবাবুকে খুব পছন্দ করত। মনে মনে চাইত অজিতবাবু ওর সঙ্গে খেলা করুক—কথা বলুক। কিন্তু অজিতবাবু যতটা সম্ভব ডিককে এড়িয়ে চলত।

প্রথম প্রথম অজিতবাবু এমন বিরক্ত বোধ করেছিল যে ঠিক করে ফেলেছিল এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। মিসেস ডয়েগ ব্যাপারটা বুঝে ডিককে খুব ধমক দিয়েছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি অজিতবাবু এই বাড়িতে এসে অনেকগুলো বিশেষ সুবিধা পেল—যা বিলেতের অনেক ভারতীয় ছাত্রই পান নি। সেই কারণেই এ বাড়ি ছাড়তে পারল না। মিসেস ডয়েগ অজিতবাবুকে নিজের ছেলের মত দেখতেন। থাকা, খাবার সুখ সুবিধের দিকে সব সময় নিজে লক্ষ্য রাখতেন। বিলেতের বেশির ভাগ ভারতীয় ছাত্ররা নিজের হাতে রান্না করে খেত। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা অজিতবাবুকে নিজে রান্না করে দিতেন। অজিতবাবুও ওঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। সময় পেলেই ওঁর কাছে

বসে গল্প করত, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিত। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে আপনজনের সম্পর্ক গড়ে উঠল।

দিনগুলো ভালই কাটছিল। কিন্তু আকস্মিক ভাবেই একদিন ছোট্ট একটা ঘটনা অজিতবাবুকে বিশ্রী একটা ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিল।

একজন মহিলা বসে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। [পৃষ্ঠা ৪৯৫

একদিন দুপুরবেলায় ডিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার এল। ওষুধ দিলেন। বিশেষ কোনো উপকার হোলো না। মিসেস ডয়েগ সারাক্ষণ ডিকের কাছে বসে রইলেন। অজিতবাবু যতটা সম্ভব মিসেস ডয়েগের সঙ্গে সঙ্গে রইল। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় সাহায্য করল। মাঝে মাঝে ডিকের কাছে যেত। ডিক করুণ চোখে অজিতবাবুকে চেয়ে চেয়ে দেখত।

দিন ছয়েক পরে মিসেস ডয়েগ ডাক্তারের পরামর্শে ডিককে কুকুরদের হাসপাতালে দিয়ে এলেন। তারপর থেকেই উনি প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। নিজেও খাওয়া ভুললেন। অজিতবাবু অনেক কষ্টে মিসেস ডয়েগকে যে ভাবে সাহায্য করা দরকার তা করবার চেষ্টা করল। কিন্তু যেহেতু কুকুর পছন্দ করত না সেহেতু কুকুর হাসপাতালের দিকে বেশী যেত না! তবে বাড়ির বাইরে কাজে গিয়েও মিসেস ডয়েগের সঙ্গে টেলিফোনে সব খবরাখবর রাখত।

দিন পাঁচেক পরের কথা। টিফিন পিরিয়ড। অজিতবাবু বাইরের একটা টেলিফোন বুথ থেকে মিসেস ডয়েগের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। মিসেস ডয়েগ অজিতবাবুর কণ্ঠস্বর পেয়েই চিৎকার করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন—জান: হাসপাতালের ডাক্তাররা কি করেছে। আমাকে না জানিয়ে 'পুট টু স্লিপ'-এর ব্যবস্থা করেছে।...

অজিতবাবু ওঁর কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল—ভালই তো করেছে। ওর যা প্রয়োজন ছিল ডাক্তাররা তাই করেছে…

অজিতবাবু নিজের কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই শুনল মিসেস ডয়েগ ভীষণ জোরে কাঁদতে শুরু করেছেন এবং এক সময়ে কান্না থামিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে বললেন—কি বললে 'পুট টু স্লিপ'-এর ব্যবস্থা করে ভাল করেছে! এ ধরনের কথা তুমি কখনও বলতে পার এ আমি ভাবতে পারি নি! আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। আজই তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। তার পরের কথাগুলো কান্নার স্বরে আর বোঝা গেল না। লাইনটা কেটে গেল। বোঝা গেল মিসেস ডয়েগ লাইনটা ছেড়ে দিলেন।

অজিতবাবু হতভম্ব হয়ে গেল। সে ভাল কথাই বলল অথচ ভদ্রমহিলা চটে গেলেন। তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবেই বা কোথায়। তারপরেই মনে হোলো ডিকের অসুখের ব্যাপারেই মিসেস ডয়েগের মাথার ঠিক নেই।

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এসে অজিতবাবু নানা কথা ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একজন পরিচিত সাহেবকে তার নতুন বিপদের কথা খুলে বলল। সাহেব ভদ্রলোক সব ঘটনা শুনে গভীর বিস্ময়ে বলল—আপনি করেছেন কি! মিসেস ডয়েগের রাগ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ডিককে পুট টু স্লিপের ব্যবস্থা করেছে মানে, ঘুম পাড়িয়ে রাখে নি ইনজেকশন দিয়ে চিরকালের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এক্ষুণি গিয়ে মিসেস ডয়েগের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।

অজিতবাবু নিদারুণ লজ্জায় পড়ে গেল। সে না জেনে কি বলে ফেলেছে! হঠাৎ ডিকের জন্য ভীষণ একটা কষ্ট অনুভব করল। যতদিন ডিক বেঁচে ছিল ততদিন বুঝতেই পারে নি ডিককে সে এত ভালবাসত। সেই ডিক বেঁচে নেই! অজিতবাবুর চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগল। কোনো রকমে চোখ মুছে নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু বাড়ির গেটের সামনে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে ডিক আর কোনদিন ছুটে আসবে না। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটোছুটি করবে না।

বাড়ির গেটে প্রবেশ করে অজিতবাবু দেখতে পেল মিসেস ডয়েগ বাইরের ঘরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর তার কাছে পাশের বাড়ির একজন মহিলা বসে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

অজিতবাবু চট্ করে ঘরে ঢুকে কোনো ভূমিকা না করেই বলল—মিসেস ডয়েগ!

বিশ্বাস করুন 'পুট টু স্লিপ' কথাটার সত্যিকারের মানেটা আমি জানতাম না। আমাকে ক্ষমা করুন।

মিসেস ডয়েগ ক্ষণিকের জন্য অজিতবাবুর দিকে চাইলেন। তিনি বোধহয় অনুভব করলেন অজিতবাবু সত্যি কথাই বলছে। তাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চল। ডিককে শেষবারের মত দেখে আসি। তারপরেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বিশ্বাসের কথা

রিপ্লে

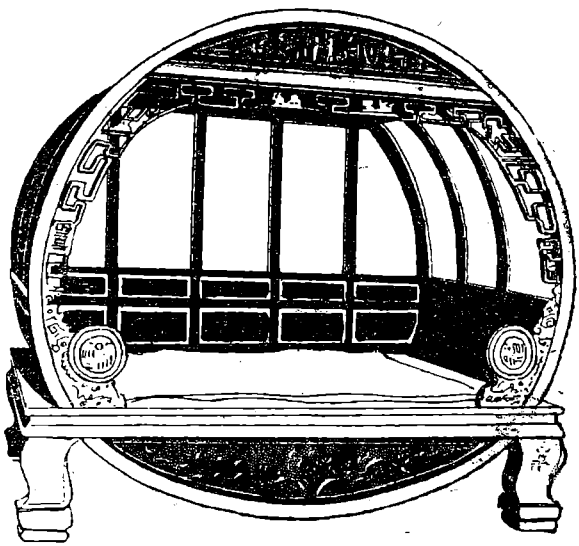

আজও সাধুরা নিয়মিত ভাবে খাটের চাদর পালটে পাও চির আগমনের অপেক্ষায় বসে আছেন। পাও চি ছিলেন চীন দেশের একজন সাধু। তিনি নানা অদ্ভুত অলৌকিক কাজ করে গেছেন। তিনি ৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান চীনদেশের হ্যাংচো শহরের মেমোরিয়াল টেম্পেলে। মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন আবার আমি ফিরে আসব।

পাও চির ফিরে আসার কথা তাঁর সহযোগী সাধুরা অবিশ্বাস করেন নি। তিনি যে কোন সময়ে আবার আসতে পারেন ভেবে তাঁরা নিয়মমত তাঁর বিছানার চাদর পালটে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। শুধু তাঁরাই নন ১৪ শতাব্দী ধরে উত্তরাধিকার পরম্পরায় আজও যারা সেই মঠে সাধু হয়ে আছেন তাঁরাও আজ অবধি পাও চির খাটের চাদর বদলে সব সময়ে পরিষ্কার করে রাখছেন।

এই দীর্ঘকালে পাও চির বিছানার চাদর প্রায় দশ লক্ষ বার বদল করা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সেই মঠের সাধুদের বিশ্বাস পাও চি একদিন আসবেই আসবেন। কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় কেষ্ট।

বছর ঘুরে চলে। আনন্দ প্রতি বসন্তকালে চলে যায় আর শীতকালে ফিরে আসে।
আরে, আনন্দ যে! এত দিনে আমাদের মনে পড়লো?
আমার ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, তোমরা বেশ বড় হয়ে গেছ দেখছি!
একদিন আনন্দ আর মেয়ে দুটো মিলে ঘুরতে ঘুরতে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। সেই সময়
বাঁচাও! কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও!

এই বোকার দল ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমার এই দুর্দশা দেখে বেশ মজা লাগছে না? শীগগির এসে আমাকে উদ্ধার কর।
তোমার এ অবস্থা হ'ল কি করে?
তোদের কি একেবারেই বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, যে এটা কি করে হয়, বুঝতে পারছিস না? আমি যেই কাঠটা চিরেছি অমনি ওতে আমার দাড়িটা আটকে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি আমাকে মুক্ত কর।
দাড়ি ছাড়াবার জন্য তখন দুই বোনে প্রাণপণে টানতে লাগল
সোনা, এদিকে এসো

(চলবে)

অনিল ভৌমিক

৫

আমদাদ শহরটা নেহাত ছোট নয়। ফ্র্যান্সিস বেশিক্ষণ ঘুরতে পারল না। কাঁধটা ভীষণ টনটন করছে। ব্যথাটা কমানো দরকার। ফ্র্যান্সিস খুঁজে খুঁজে মীজা হেকিমের বাড়িটা বের করল। দেউড়ীতে পাহারাদার ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফ্র্যান্সিস অনুনয় করল—ভাই আমি অসুস্থ, চিকিৎসার জন্যে এসেছি।

—সবাই এখানে চিকিৎসার জন্যেই আসে। গম্ভীর গলায় পাহারাদার বলল—আগে হেকিম সাহেবের পাওনা জমা দাও—তারপর।

—আমি গরিব মানুষ—

—তাহলে ভাগো। পাহারাদার চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্র্যান্সিস পাহারাদারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। লোকটা আঁতকে উঠল। কান কামড়ে দেবে নাকি? ফ্র্যান্সিস ফিসফিস করে বলল—হেকিম সাহেবকে বলো গে—একজন রোগী এসেছে—ফজল আলী পাঠিয়েছে।

—ফজল আলী কে?

—সে তুমি চিনবে না। তুমি গিয়ে শুধু এই কথাটা বলো।

—বেশ। পাহারাদার চলে গেল। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বলল—কী মুশকিল, আগে বলবে তো ভাই। আমার চাকরি চলে যাবে। শীগ্‌গির যাও—হেকিম সাহেব তোমাকে ডাকছেন।

ফ্র্যান্সিস মৃদু হেসে ভেতরে ঢুকল। কার্পেটপাতা মেঝে। ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। তার ওপর হেকিম সাহেব বসে আছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। চুল, ভুরু তুলোর মত সাদা। কানে কম শোনেন। কয়েকজন রোগী ঘরে ছিল। তাদের বিদায় করে ফ্র্যান্সিসকে ডাকলেন। ফ্র্যান্সিস সব কথাই বলল। মাথাটা এগিয়ে সব কথা শুনে জামাটা খুলে ফেলতে বললেন। ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর একটা কাঁচের বোয়ম থেকে ওষুধ বের করে লাগিয়ে দিলেন। একটা পট্টিও বেঁধে দিলেন। বললেন—দিন সাতেকের মধ্যেই সেরে যাবে। ফ্র্যান্সিস কোমরে গোঁজা থলি থেকে একটা মোহর বের করল। তাই দেখে হেকিম সাহেব হাঁ হাঁ করে উঠলেন—না না—কিছু দিতে হবে না।

হেকিম সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফ্র্যান্সিস এবার আমদাদ শহর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দেখার জিনিস তো কতই আছে। সব কি আর একদিনে দেখা যায়? সুলতানের শ্বেতপাথরে তৈরী প্রাসাদ, প্রাসাদের পিছনে সমুদ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুর্গ, মন্ত্রীর বাড়ি, বিরাট ফুল বাগিচা বাজার হাট এসব দেখা হল। বেড়াতে বেড়াতে খিদেও পেয়ে গেল খুব। কিন্তু খাবে কী করে? খাবারের দোকানে তো আর মোহর নেবে না। সুলতানী মুদ্রাও তো সঙ্গে কিছু নেই। ফ্র্যান্সিস একটা সোনা-রূপোর দোকান খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

শুঁটকে চেহারার দোকানী খুব মনোযোগ দিয়ে নিকষ পাথরে মোহরটা বারকয়েক ঘষল। তারপর জিজ্ঞেস করলে—এ সব মোহর তো এখানে পাওয়া যায় না—আসল জিনিস। আপনি পেলেন কোথায়?

—ব্যবসার ধান্ধায় কত জায়গায় যেতে হয়।

—তা তো বটেই। যাকগে—আমি আপনাকে পাঁচশো মুদ্রা দিতে পারি।

—বেশ তাই দিন।

শুঁটকে চেহারার দোকানীটা মনে মনে ভীষণ খুশী হল। খুব দাঁও মারা গেছে। অর্ধেকের কম দামে মোহরটা পাওয়া গেল। ফ্র্যান্সিস কিন্তু ক্ষতির কথা ভাবছিল না। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিছু না খেলেই নয়। সুলতানী মুদ্রা তো পাওয়া গেল। এবার খাবারের দোকান খুঁজে দেখতে হয়। খুব বেশী দূর যেতে হল না। বাজারটার মোড়েই জমজমাট খাবারের দোকান। শিক কাবাবের গন্ধ নাকে যেতেই ফ্র্যান্সিসের খিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকে রুটি আর শিক কাবাবের ফরমাইশ করল। খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল। যেভাবে ও খেতে লাগল তা দেখে যে কেউ বুঝে নিত ওর রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে। ব্যাপারটা একজনের নজরেও পড়ল। সেই লোকটা অন্য জায়গায় বসে খাচ্ছিল।

এবার ফ্র্যান্সিসের সামনে এসে লোকটি বসল। ফ্র্যান্সিস তখন হাপুস হুপুস খেয়েই চলেছে। লক্ষ্যই করে নি, কেউ ওর সামনে এসে বসেছে। কাজেই লোকটা যখন প্রশ্ন করল—আপনিও বোধহয় আমার মতই বিদেশী।

ফ্র্যান্সিস বেশ চমকেই উঠেছিল। খেতে খেতে মাথা নাড়ল।

—আমার নাম মকবুল হোসেন—কার্পেটের ব্যবসা করি।

—ও। ফ্র্যান্সিস আপনমনে খেতে লাগল।

—তেহরানে বাড়ি আমার।

ফ্র্যান্সিস সে কথার কোন উত্তর দিল না। খেয়ে চলল। মকবুলও চুপ করে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ফ্র্যান্সিসের খাওয়া শেষ হয়। মকবুলের চেহারাটা বেশ নাদুসনুদুস। মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। ওর ধৈর্য দেখেই ফ্র্যান্সিস বুঝল—একে এড়ানো মুশকিল। লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার কায়দাকানুন ওর নখদর্পণে।

খাওয়া শেষ করে ফ্র্যান্সিস ঢেকুর তুলল। মকবুল এবার নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল—আপনার খাওয়ার পরিমাণ দেখে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিল।

—হাসুক গে। তাই বলে আমি পেট পুরে খাবো না?

—আমিও তাই বলি—মকবুল একইভাবে হেসে বলল—আপনার মত অমন সুন্দর স্বাস্থ্য অটুট রাখতে গেলে এটুকু না খেলে চলবে কেন! আলবৎ খাবেন—কাউকে পরোয়া করবেন কেন?

ফ্র্যান্সিসের খাওয়া শেষ হল। এতক্ষণ মকবুল আর কোন কথা বলে নি। এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বলল—জানেন ঠিক আপনার মত আমিও একদিন গোগ্রাসে খাবার গিলেছিলাম। কোথায় জানেন, ওঙ্গালিতে।

—ওঙ্গালি? ফ্র্যান্সিস কোনদিন জায়গাটার নামও শোনে নি।

—হ্যাঁ—মকবুল হাসল—ওঙ্গালির বাজারে। কারণ কী জানেন? তার আগে চারদিন শুধু বুনো ফল খেয়ে ছিলাম।

—কেন?

—বেঁচে থাকতে হবে তো! হীরে তো আর খাওয়া যায় না।

—হীরে? ফ্র্যান্সিস অবাক্ হয়ে বেশ গলা চড়িয়েই বলল কথাটা।

—শ্ শ্—। মকবুল ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। তারপর আর একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলতে লাগল—এখানকার মদিনা মসজিদের গম্বুজটা দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ।

—তার চেয়েও বড়।

—বলেন কি ?

—কিন্তু সব বেফয়দা।

—কেন ?

—আমরা তো আর জানতাম না যে হীরেটা নাড়া পেলেই পাহাড়টায় ধ্বস নামবে ?

—আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল ?

—হ্যাঁ, ওঙ্গালির এক কামার। তাকে নিয়েছিলাম হীরের যতটা পারি কেটে আনবো বলে।

—সেটা বোধহয় আর হল না।

—হবে কী করে তার আগেই ধ্বস নামা শুরু হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন ? এতক্ষণে ফ্র্যান্সিস উৎসুক হল। মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড় হীরে। শুধু হীরে না বলে হীরের ছোটখাটো পাহাড় বলতে হয়। এও কি সম্ভব ?

—তাহলে একটু মুরগীর মাংস হয়ে যাক।

—বেশ। ফ্র্যান্সিস দোকানদারকে ডেকে মুরগীর মাংস দিয়ে যেতে বলল।

মাংস খেতে খেতে মকবুল শুরু করল—কার্পেট বিক্রীর ধান্দায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে। জায়গাটা মোম্বাসার কাছে। আমার ঘোড়ায় টানা গাড়ির চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল ভেঙে! কাজেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। এই কামারই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূর থেকে গাছগাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুহাটা প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু সূর্যটা আকাশে উঠতে উঠতে যখন ঠিক গুহাটার সমান্তরালে আসে—সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহামুখে পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে, ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে—তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা। ধরে নিয়েছে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা। ভূতপ্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

—আচ্ছা, এই আলোর খেলা কি সারাদিন দেখা যেত।

—উঁহু—সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়ত ততক্ষণই শুধু—তারপর আবার যেই কে সেই।

—সেই কামারটা এর কারণ জানতে পেরেছিল।

—না, তবে অনুমান করেছিল। ও বলেছিল—ঐ আলো হীরে থেকে ঠিকরোনো আলো না হয়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লে সেই আলো কীভাবে ঠিকরোয় এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন ?

—ভেবে দেখুন—অত আলো—মানে আমি তো পরে সেই আলো আর রঙের খেলা দেখেছিলাম—মানে—ভেবে দেখুন—হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিকরোয়।

—তা তো বটেই। ফ্র্যান্সিস মাথা নাড়ল! বলল—তারপর ?

—তারপর বুঝলেন, একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে আমরা তো রওনা হলাম। যে করেই হোক সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। কিছু ঝোপঝাড়, দু' একটা জংলী গাছ আর লম্বা লম্বা বুনো ঘাস—এ ছাড়া সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে আর কিস্যু নেই। নীরেট পাথুরে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবে-চিন্তেই এসেছে বুঝলাম। ও বলল—চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামব। ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি, আর তার আশেপাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধরে নামা যাবে।

সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা ঝুলিয়ে দিলাম। দড়ির মুখটা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পৌঁছে দেখি গুহা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকী পথটা গাছের ডাল, গুঁড়ি, লতাগাছ এসব ধরে ধরে শ্যাওলা-ধরা পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে রেখে একসময় গুহাটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গা মানে সেই কামারটাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান সেটা বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরো দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর ?

ফ্র্যান্সিস তখন এত উত্তেজিত যে সামনের খাবারের দিকে তাকাচ্ছেও না। মকবুল কিন্তু বেশ মৌজ করে খেতে খেতে গল্পটা বলে যেতে লাগল।

—দুজনে গুহাটায় ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই—তারপরেই একটা খাদ। খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথুরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়োখেবড়ো গা—অনেকটা জমাট আলকাতরার মত। হাত দিয়ে দেখলাম বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কী রঙ, ঠিক বুঝলাম না! তবে দেখলাম যে ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন কেউ পুঁতে রেখে দিয়েছে।

হাতুড়িটা দিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। [পৃষ্ঠা ৫০৪

বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটোনো বড় বড় পাথর-গুলোর ওপর একটা ছুঁচোলো মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিলো। আমি বুঙ্গাকে ডাকলাম—বুঙ্গা দেখ তো এটা কিসের ঢিবি?

বুঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই।

ঠিক তখনই সূর্যের আলোটা সরাসরি গুহার মধ্যে এসে পড়ল। আমরা ভীষণ-ভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়োখেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন! সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ। সমস্ত গুহাটায় তীব্র চোখঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে বললাম—বুঙ্গা শীগগির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দুজনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র তীক্ষ্ণ চোখ অন্ধ করা আলোর বন্যা বয়ে চলল জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে চোখ খুললাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। অবাক্ কাণ্ড! ও কাঁদছে কেন? অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বুঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে—অত বড় হীরে—আমার সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে—আমি কত বড়লোক হয়ে যাব—আমি পাগল হয়ে যাবো—।

বুঝলাম প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় ও কাঁদতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। 'আস্তে আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বুঙ্গাকে বললাম—এসো আগে খেয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু কাকে বলা। বুঙ্গা এখন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সেই হীরের ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচলো হাতুড়িটা দিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো টুকরো হীরে চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বুঙ্গা হীরের টুকরোগুলো পকেটে পুরতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর? ফ্র্যান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—এবার বুঙ্গা করল এক কাণ্ড! গুহার মধ্যে পড়ে-থাকা একটা বড় পাথর তুলে নিল। তারপর দু হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙ্গা কি অত সোজা? সে কথা কাকে বোঝাবো তখন? ও পাগলের মত পাথরে ঘা মেরেই চলল। ঠক্—ঠক্—পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ—

—কী হল?

—সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভেতরে শুনলাম একটা গম্ভীর গুড় গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এলো পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। গুহার মুখের কাছে ছুটে এলাম। দেখি—পাহাড়ের মাথা থেকে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া পেয়েছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই। গুহা ছেড়ে পালাতে হবে। অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম। টান দিতেই দেখি—ওটা আলগা হয়ে গেছে।

বুঝলাম—যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন গাছের ডালে বা ঝোপে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম। যা ভেবেছি তাই। দড়ির মুখটা ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে টলে পড়ে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু বুঙ্গা? ও কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, বুঙ্গার হুঁশও নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলেছে। ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম—বুঙ্গা শীগ্‌গির চল—নইলে মরবি। কে কার কথা কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। এখন ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছুচোলো মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। বুঝলাম—ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকেই মেরে বসবে। ওকে আর আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।

গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধুলো ঝুপ ঝুপ করে পড়তে শুরু করেছে। আর দেরি করলে আমারও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে। পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে।　　(ক্রমশঃ)

আইন ভবন—

আমাদের দেশে যেখানে আইন পাস হয় সে বাড়ির নাম এসেম্বলী হাউস। কেন্দ্রে আইন পাসের বাড়ির নাম পালামেণ্ট হাউস। ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন পাসের স্থান। নাম ইউ এস ক্যাপিটল।

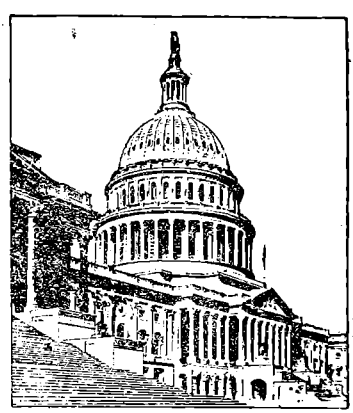

সব্যসাচী

৫

রাত যখন ভোর হল, আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। বর্ষা ঋতুটা অবশ্য বিদায় নিতে বসেছে, কিন্তু যাওয়ার আগে একচোট ঝড়ঝাপটা সে যেন উপহার দিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞই। গিরি-চূড়ায়-চূড়ায় নিবিড় ঘনঘটা। কয়েকদিন থেকেই সেটার বিস্তার আর কলেবর বেড়েই চলেছে।

এই গিরিমালার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঁকি দিয়ে ফিরছে টারজান আর ভ্যালথর। দেখছে খেনার উপত্যকার কোন একটা পরিচিত দিকচিহ্ন কোনদিকে চোখে পড়ে কি না। ক্রমাগত হতাশাই জুটছে তাদের বরাতে।

ভোর হয়েছে, কিন্তু একরত্তি রোদ্দুর কোথাও নেই। রাতের শীত শীত ভাবটা বরং যেন আরও কনকনে হয়ে উঠছে বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণতঃ ঘুম ভাঙ্গার পরেই ওরা পেটভরে প্রাতরাশ সেরে নেয়। আজ গাছের ডালের সুখশয্যা ছেড়ে মাটিতে নামার পরই চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করল টারজান—"খাব এখন পরে। আগে একটু হাঁটাচলা করি। রক্তটা চনমন করে উঠুক।"

"পরেই খাব"—সায় দিল ভ্যালথর—"যদি খাবার জোটে।"

"টারজান না খেয়ে থাকে না কখনো"—জবাব দিল মহাকপি লালিত বনের রাজা—"তবে শিকারের মেজাজ আসা চাই। সে মেজাজ আসবে যখন, খাদ্যও জুটে যাবে দেখো।"

জায়গাটাকে খদই বলা যেত, যদি এত প্রশস্ত না হত। চারদিকেই খাড়া পাহাড়। একটা চতুষ্কোণ বাক্স যেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে ওরা চলল। দেখছে এমন একটু

ঢালু জায়গা কোথাও পাওয়া যায় কি না, যেখানে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করা যায়। অবশেষে তেমন জায়গা সত্যিই পাওয়া গেল। অর্থাৎ টারজানেরই বিবেচনায় সেটা তেমনি জায়গা। ভ্যালথরের? টারজান উঠে যাচ্ছে বুনো ছাগলের মত দৃঢ় নির্ভীক পদক্ষেপে; ভ্যালথর কোন্ লজ্জায় বলবে যে তার ভয় করছে উঠতে? বলছে না কিছুই সে, উঠেই চলেছে টারজানের পিছু পিছু। কিন্তু প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে একবার বলে নিচ্ছে—"আর দেখতে হবে না, এইবারই শেষবার পা ফেলছি।"

"পেয়েছি! পেয়েছি! ঐ যে জারাটার!" [পৃষ্ঠা ৫০৮

তবে পড়ল না ভ্যালথর। শেষ পর্যন্ত টারজানের সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়াল এক অধিত্যকার মাথায়। সেখান থেকেও ধাপে ধাপে চড়াই উঠে গিয়েছে, দৃষ্টির সীমান্তে দাঁড়ানো এক সারি তুঙ্গ শিখর পর্যন্ত।

এতক্ষণের চড়াই ভাঙার মেহনতে ভ্যালথরের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ঢিপঢিপ করছে সশব্দে। বেচারী নিঃশ্বাস ফেলছে ধুকতে ধুকতে, কিন্তু টারজানের তরফে শ্রান্তির কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সে আরও উপরে উঠবার মতলবে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একবার সাথীর দিকে চোখ ফিরিয়েই সে থেমে পড়ল—"এখন আর নয়, একটু বিশ্রাম করে নাও।"

সারা দিন তারা হাঁটছে, উত্তর-পুব লক্ষ্য করে। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে মাঝে মাঝে, আর সর্বদাই এমন একখানা মুখ করে রয়েছে প্রকৃতি, যেন এই মুহূর্তেই আকাশ ভেঙে মুষলধারায় বর্ষা নামবে। দুপুর নাগাদ একটা শিকার পেলো টারজান, খেলো দু'জনেই পেট ভরে। খেয়েই যাত্রা শুরু করল আবার। বসে থেকে কী হবে? এক ফোঁটা রোদ্দুর নেই, বাতাস ভিজে, ঠাণ্ডা। বসে থাকলেই হাত-পা শীতে কুঁকড়ে আসে।

সূর্য অনেকটাই ঢলেছে পশ্চিমে। এমন সময় একটা গভীর সুড়ঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে তারা এক তুঙ্গ অধিত্যকার পিঠে পৌঁছোলো। ঠিক অব্যবহিত সামনেটাতে কোন পাহাড়

নেই। কিন্তু দূরে? ঝিরঝিরি বৃষ্টির দরুন ঝাপসা হয়ে আছে ওদিকটা, কিন্তু তারই ভিতর দিকে আকাশছোঁয়া কয়েকটা গিরিচূড়া চোখে পড়ল। হঠাৎ ভ্যালথরের কণ্ঠ থেকে ছিটকে বেরুলো একটা উত্তেজিত উল্লাসের ধ্বনি—"পেয়েছি! পেয়েছি! ঐ যে জারাটর!"

ওর অঙ্গুলিনির্দেশ অনুযায়ী একটা বিশেষ জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই টারজান দেখতে পেল বিরাট এক গিরিশিখর। তার মাথাটা সমতল আর তার উপরে প্রায় তাকে স্পর্শ করেই হাওয়ায় ভাসছে ঈষৎ রক্তাভ মেঘের পাঁজা। ভাল করে দেখে নিয়ে টারজান বলল—"ঐ তাহলে জারাটর? আর তোমার থেনার হল ওর সোজা পুবে?"

"নিশ্চয়! আর তার মানেই হল এই যে এই অধিত্যকার ঠিক নীচেই হল অন্থার, আমাদের সামনেই একেবারে। আর কী! এইবার চলে এসো।"

এখন আবার পথ দেখাবার ভার ভ্যালথর তুলে নিল নিজের কাঁধে। দু'জনে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। ঘাসে-ঢাকা সমতল একটা প্রান্তরই যেন এই অধিত্যকার মাথায়। তারই উপর দিয়ে সোজা মাইল দুই পথ ওরা চলে গেল একেবারে শেষ প্রান্তে। নীচে বিশাল উপত্যকা একটা।

"অন্থারের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে এসে পড়েছি আমরা"—বলল ভ্যালথর, "ঐ যে দেখা যায় ক্যাথনি, যাকে আমরা বলি সোনার শহর। ঐ জঙ্গলটার ও-মাথায়, নদীর বাঁকের উপর দেখতে পাচ্ছ না একটা শহর? খুবই সমৃদ্ধ শহর। কিন্তু ওখানকার লোকেরা আমার দেশের শত্রু।"

বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়ছে তখন। তারই ভিতর দিয়ে দূরে একটা পাঁচিল-ঘেরা শহর অস্পষ্টভাবে যেন নজরে আসছে টারজনের। একদিকে অরণ্য, অন্যদিকে নদী। বাড়িগুলো সবই প্রায় সাদা, কিন্তু অনেক বাড়িরই উপরে হলদে রঙের গম্বুজ দেখা যায় যেন। নদী টারজানদের সমুখেই, তার ওপারে শহর। নদীর উপরে সেতু রয়েছে একটা। দুর্যোগ দিনের আবছা আলোতে তারও রং ঘোলাটে হলদে মনে হয়। কী জিনিস ওগুলো, হলুদ যার রং?

উপত্যকার প্রান্ত থেকে প্রান্ত অবধি বইছে ঐ নদী। কমপক্ষে চৌদ্দ পনেরো মাইল ত বটেই। পর্বত থেকে বেরিয়ে অনেক অনেক ছোট নদী গিয়ে মিশেছে ঐ বড় নদীতে। নদীর ধারে ধারে একটা সুচিহ্নিত রাজপথও বর্তমান। সেও উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি প্রসারিত। কিন্তু উপত্যকার মাঝামাঝি এক জায়গায় রাস্তাটা থেকে শাখাপথ বেরিয়ে গিয়েছে একটা, সেটা আবার এক নাতিপ্রশস্ত উপনদীর কূলে কূলে এগিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। টারজানদের পায়ের নীচে সমতল প্রান্তর একটি, তার মাঝে মাঝে বড় গাছ একটা দুটো। এ-প্রান্তর আবার

অন্থারের উত্তর মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীর ওপারে ঘন অরণ্য গিয়ে মিশেছে খাড়া পাহাড়ের গায়ে।

"শহরটাকে সোনার শহর বলে নাকি লোকে? কেন বলে?"—প্রশ্ন করে টারজান।

"কেন বলে? দেখছ না ঐ সোনার গম্বুজগুলো? আর ঐ সোনার সেতু?"—জবাব দেয় ভ্যালথর।

"সোনালী রং দিয়ে রাঙানো বুঝি?"

"মোটেই না, মোটেই না! নিরেট সোনা দিয়ে গড়া ওসব। সোনার চাঙড় ইয়া বড় বড় সব সোনার চাঙড় দিয়ে।"—জবাব দেয় ভ্যালথর।

ভ্রূ-জোড়া ধনুকের মত বেঁকে গেল টারজানের। হঠাৎ একটা চিন্তা মগজের মাঝে চমক দিয়ে গেল। এই অনন্ত অফুরন্ত স্বর্ণভাণ্ডারের কথা বহির্বিশ্বে একবার পৌঁছোয় যদি, সঙ্গে সঙ্গে কি না পরিবর্তন ঘটে যাবে এই নিদ্রালু উপত্যকায়। কলকারখানা বসবে, রেল চলবে, প্লেন উড়বে। চিমনির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো চাঁদোয়া রচিত হবে ঐ সব হলদে গম্বুজের উপরে।

"এত সোনা ওরা পায় কোথায়?"—সে জিজ্ঞাসা করল।

"শহরের দক্ষিণে ঐ যে পাহাড়ের শ্রেণী, ওর ভিতরে সারি সারি সোনার খনি আছে!"—বলল ভ্যালথর।

টারজান চুপ করে রইল একটু, তারপর বলল—"থেনার কোথায়? তোমার নিজের দেশ?"

"অন্থারের পুবে ঐ যে পাহাড়, ওর ওপারেই। ক্যাথনির মাইল পাঁচেক উপরে, দেখছ না ঐ নদী আর ঐ রাস্তা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলের মধ্যে? আবার জঙ্গল ভেদ করে পাহাড়ের অন্দরমহলে একেবারে?"

"তা দেখছি।"—বলল টারজান।

"ঐ রাস্তা আর ঐ নদী চলে গিয়েছে শহীদ-গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে একেবারে থেনার উপত্যকায়। ঐ উপত্যকারই প্রায় মাঝামাঝি সামান্য একটু উত্তর-পুব ঘেঁষে আমাদের অ্যাথনি, গজদন্তের শহর।"

"গজদন্তের শহর! ঐ গজদন্তের খবর আদায় করার জন্যই না শিফ্‌টারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তোমায়?"

"ঠিক। পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলি। দক্ষিণ দিকে চলে গিয়ে পড়ে যাই শিফটাদের হাতে—"

"যাক, তোমার অ্যাথনি থেকে তা হলে এখন কত দূরে আছি আমরা?"—কাজের কথায় ফিরে আসে টারজান।

"তা পঁচিশ মাইল হতে পারে। হয় ত কিছু কমই—"

টারজান প্রস্তাব করল—"তাহলে এখনই রওনা হওয়া যাক। বৃষ্টি যখন থামছে না বসে থাকার চাইতে হাঁটাতেই আরাম পাওয়া যাবে বেশী। বিশেষ করে এটা যখন আশা করা যায় যে তোমার গজদন্তপুরীতে পৌঁছোলে তখন আর শুকনো আশ্রয়ের অভাব থাকবে না আমাদের।"

"নিশ্চয়ই থাকবে না"—জোর দিয়ে বলে ওঠে ভ্যালথর—"কিন্তু এক্ষুণি হাঁটা শুরু করার অসুবিধা আছে একটু। দিনের আলো থাকতে থাকতে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত হবে না আমাদের। বলি নি যে ওরা আমাদের শত্রু?"

টারজান মাথা নাড়ল শুধু।

"ক্যাথনির তোরণে তোরণে পাহারা আছে"—বলে যাচ্ছে ভ্যালথর—"তাদের নজর এড়িয়ে পালানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সে চেষ্টা করতে গেলেই আমরা হয় মারা পড়ব, আর নয় ত ধরা পড়ব ওদের হাতে। রাতে পালানোও যে খুব নিরাপদ, তা অবশ্য বলছি না আমি। কারণ সিংহগুলো ত রয়েছেই! কিন্তু দিনে বিপদ দুই দিক থেকে, এদিকে সিংহ ওদিকে সান্ত্রী।"

"সিংহ কী?"—টারজান জিজ্ঞাসা করে অবাক্ হয়ে।

"ক্যাথনির লোকেরা সিংহ পোষে হে, সিংহ পোষে। ঐ যে উপত্যকা দেখছ, ওতে গিজগিজ করছে সিংহ। ঐ যে আমাদের পায়ের নীচে বিশাল প্রান্তর, ওর নামই হল সিংহের মাঠ। অন্ধকারে পালাবার চেষ্টা করাই তবু কতকটা নিরাপদ হবে।"

কাঁধ একটু দুলিয়ে টারজান বলল—"যা ইচ্ছে তোমার। আমার কথা যদি বল, এখনই যাত্রা করি আর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করি, একই কথা।"

"অপেক্ষা করার অসুবিধা অবশ্য অনেক।"—স্বীকার করল ভ্যালথর—"বৃষ্টি হচ্ছে খুব, ঠাণ্ডা লাগছে—"

"অভ্যেস আছে ওসব আমার"—বলল টারজান—"বৃষ্টি থামবে এক সময়!"

"একবার যদি ক্যাথনিতে পৌঁছোতে পারি! আমাদের বাড়িতে ইয়া বড় বড় আগুনের কুণ্ড। এতক্ষণ, এই দিনের বেলাতেই জ্বলে উঠেছে আগুন সেখানে। বাদলার দিন কিনা।"

"অ্যাথনিতেও আগুন জ্বলছে, আকাশেও সূর্য অনেক রোদ্দুর ছড়াচ্ছে, মানে ঐ

মেঘরাজ্যের উপরে। তা অ্যাথনির আগুনই বল আর মেঘরাজ্যের উপরের রোদ্দুরই বল—কোন কিছুই আমাকে আরাম দিতে পারছে না এখানে। বৃথাই ওদের কথা তোলা।"

"তবু, অ্যাথনির কথা বলেও আনন্দ আছে আমার। জানো? ক্যাথনিতে লোকে সিংহ পোশে যেমন, আমরা তেমনি পুষি হাতি! ওদের যেমন অফুরন্ত সোনা, আমাদের তেমনি গজদন্তের পাহাড়। অবশ্য কিছু কিছু সোনা আমাদেরও আছে—"

ওরা কথা কইছে, এদিকে সূর্য অস্ত গিয়েছে মেঘরাজ্যের আড়ালে। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে এমনভাবে যে তা দেখলে ভয় হয়। উত্তরের গিরিচূড়াগুলো পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল এদের দৃষ্টি থেকে। "এইবার চল, রওনা হওয়া যাক।"—বলল ভ্যালথর।

অধিত্যকার প্রান্তে একটা ঢালু ভাঙ্গন ওরা আগেই দেখে রেখেছে। সেইটি ধরেই ওরা নীচের উপত্যকায় নামছে। কড়-কড়-কড়াৎ মেঘ ডাকছে মাথার উপরে, চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মুহুর্মুহু। বৃষ্টি নামল প্রপাতের আকারে। প্রবল জলস্রোত নামছে ভাঙ্গন বেয়ে, ওদের ভাসিয়ে নিয়েই যে তে চায় যেন।

কোনমতে ওরা ত পৌঁছোলো সমতলে।

সূচীভেদ্য অন্ধকার। তার বক্ষ বিদীর্ণ করে ঘন ঘন চমকে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলক। মেঘের গর্জনের বিরাম নেই আর। কানে তালা লেগে যেতে চায়। বৃষ্টির ঝাপটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের উপরে, সমুদ্রতরঙ্গের মত। প্রকৃতির তাণ্ডব টারজান অনেক দেখেছে, আজকার এ-দুর্যোগ তারও কাছে যেন লাগছে অভূতপূর্ব।

কথা বলার উপায় নেই। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলেই দু'জন এক সাথে চলতে সক্ষম হচ্ছে। আর ঐ বিদ্যুতের দরুনই ভ্যালথর সোনার শহরের দিকে অগ্রসর হতে পারছে, প্রান্তরের বিশাল বিস্তারের ভিতর ঠিক পথটি চিনে। এই পথ ধরে ঠিকঠিক যেতে পারলে তবেই মিলবে শহীদ-গিরিসংকটের রাস্তা।

অচিরেই শহরের আলো চোখে পড়ল তাদের। চৌকো আকারের এক একটা আলোর আভাস। অবশ্যই চতুষ্কোণ জানালার ওপিঠে জ্বলছে ঐ আগুনগুলি। একটু পরেই পায়ের নীচে রাস্তার স্পর্শ। এইবার তারা উত্তর মুখে যাবে, শহীদ গিরি-সংকটের দিকে। কিন্তু সাধ্য কী উত্তরে এক পা এগুবার! ঝড়ের দানব উত্তর থেকেই দক্ষিণে ছুটে আসছে। এসে আছড়ে পড়ছে ঠিক তাদের মুখের উপরে। এক একবার ঝড়ের ধাক্কায় টারজানকেও ছিটকে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে দুই চার পা।

মাইলের পর মাইল অক্লান্ত যুদ্ধ করছে ওরা দু'জন, এই ঝটিকা-দানবের সাথে। দানব যেন তুচ্ছ দুটো মানব-সন্তানের স্পর্ধা দেখে উত্তরোত্তর ক্ষেপেই উঠছে ক্রোধে। নিজের অমোঘ শক্তিভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে পরাস্ত, পযুদস্ত করতে চাইছে শত্রুদের। সবশেষে

তার অমোঘ অস্ত্র সে প্রয়োগ করল। চারিধার এমনভাবে জ্বলে উঠল বহু বিদ্যুৎশিখায় যে আলোয় আলো হয়ে গেল সমস্ত প্রান্তর কয়েক মুহূর্তের জন্য, বজ্র-নাদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সমস্ত পৃথিবী থরথর কাঁপতেই লাগল, কী যেন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায়। আর সেই সঙ্গে আকাশ থেকে টারজানদের মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল এমন বিপুল জলপ্রপাত যে তার পেষণ সইতে না পেরে তারা উবুড় হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আঁচোড় পাঁচোড় করে উঠে দাঁড়ানো মাত্রই তারা টের পেল হাঁটু সমান জলে মুহূর্ত-মধ্যে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে সমস্ত সমতলটা। এক বহুদূর প্রসারিত তীব্র জলস্রোত তাদের পাশ কাটিয়ে, তাদের পায়ের তলা দিয়ে উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলে যাচ্ছে অদূরের ঐ নদীর দিকে।

কিন্তু ঐটিই ঝটিকাদেবতার শেষ হামলা। এর পরই হাওয়ার বেগ কমে এল। বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে মেঘের কালো আস্তরণটা ছিঁড়ে গেল এক এক জায়গায়, আর সেই ছেঁড়ার ভিতর দিয়ে দুষ্টু ছেলের মত হাসিমুখে উঁকি দিতে লাগল আধখানা চাঁদ। নীচে থই-থই জল, আদিগন্ত প্লাবন নেমেছে সিংহের মাঠে। সেই প্লাবিত প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ভ্যালথর শহীদ গিরিপবত্মের দিকে নিয়ে চলেছে বনের রাজাকে।

বর্ষা ঋতুর শেষ ঝড় শেষ হল তাহলে। হল বটে, কিন্তু অদ্ভুত সব নব অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দিয়ে গেল বনের রাজার সমুখে।

সোনার সেতুই হল ক্যাথনির সিংহদ্বার। তা থেকে সাত মাইল তফাতে একটা পারঘাট বরাবরই আছে নদীতে। জল সেখানে বর্ষাকালেও কোমর ছাড়িয়ে ওঠে না। সেই পারঘাটের দিকে চলেছে ভ্যালথর। নদীটা পেরুতে পারলেই তারা শত্রুরাজ্যের এলাকার বাইরে গিয়ে পড়তে পারে। থেনার অদূরে সেখান থেকে। তিন ঘণ্টা লেগে গেল ওদের এই সাত মাইল পথ অতিক্রম করতে।

অবশেষে পৌঁছে গেল তারা নদীর ধারে।

কী আশ্চর্য! এই কি সেই চিরপরিচিত নদী? ভ্যালথর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতেই পারে না। এ যে একটা উত্তাল জলধি! আথালপাথাল ঢেউ তুলে প্রমত্ত জলপ্রবাহ দুই কূল ভাসিয়ে ডুবিয়ে ভেঙে চুরে ছুটে চলেছে সর্বধ্বংসের নেশায় দিগ্বিদিক হারিয়ে।

ভ্যালথর ইতস্ততঃ করছে সে জলে নামতে—"জল যেন বড় বেশী বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।"—বলেম্রিয়মাণ ভাবে।

"যত দেরি করবে, তত বাড়বে আরও"—বলে টারজান—"উপর পাহাড়ের জল সামান্যই ইতিমধ্যে নামতে পেরেছে, তাতেই এই অবস্থা। সে জল সব যখন নেমে আসবে

নদীতে, তোমার ঐ সোনার সেতুর উপরে উঠবে তা। যদি নদী পেরুতে হয় আমাদের, আর দেরি না করাই ভাল।"

ভ্যালথর চিন্তিত ভাবে বলল—"উভয় সংকট। চল, নেমে পড়ি। কিন্তু ঠিক আমার পায়ে পায়ে পিছনে আসবে তুমি। পারঘাটটা আমি চিনি। সে একটা সরু জিনিস, এধারে ওধারে পা ফসকালেই অগাধ জল।"

দৈবের মার দেখ। ওরাও জলে নেমেছে, ছেঁড়া মেঘগুলো আবার জোড়া লেগে গেল আকাশে, ঢেকে দিল আধেক চাঁদের দুষ্টু হাসি। গাঢ় আঁধারে জল স্থল একাকার হয়ে গেল আবার। টারজান চলেছে ভ্যালথরের পিছু পিছু, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না ভ্যালথরকে। ওদিকে ভ্যালথরের গতিও স্বাভাবতঃই দ্রুততর, কারণ পারঘাটার জলের তলে কোথায় কোন্ পাথরখানা আছে, তা তার মুখস্থ। টারজানকে হাঁটতে হচ্ছে পা টিপে টিপে।

পরাজয় মানল সিংহদমন টারজানেরও বাহুবল।

তা হোক। সব রকম কষ্টের সাথেই পরিচয় আছে টারজানের। এইভাবে নদীটা পেরুতে গিয়ে কোন বিপদ যে ঘটতে পারে এমন কথা মনের কোণেও উঁকি দেয় নি তার।

স্রোতের বেগ আজ দুর্বার। তা, তেমনি দুর্বার টারজানের পৈশিক শক্তি। ওপারে জলে নামতেই ওরা বুক-জল পেয়েছিল, এখন তা পরিণত হয়েছে গলা-জলে। ওর মধ্যে হাঁটা সম্ভব হয় কেমন করে? হঠাৎ পায়ের নীচে আর মাটি পেল না টারজান। দুরন্ত স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল আপন বেগে। পরাজয় মানল সিংহদমন টারজানেরও বাহুবল। ভেসে গল সে অজানা দেশের অকূল জলতরঙ্গে। (ক্রমশঃ)

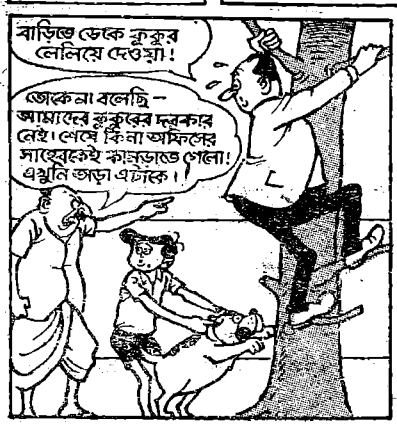

হাঁদা ভোঁদার
কুকুর পোষা
বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে একটা কুকুর নিয়ে এলুম ভোঁদা!
তোর এই কুকুর দেখলে পিসেমশাই খেপে যাবেন!
হাঁদা! শীগগির এটাকে বাড়ির বার করে দে!
কিন্তু পিসেমশাই, বাড়ির জন্যে একটা কুকুর দরকার!
পিসেমশাইকে আমি দেখাবো, যে কুকুর কত প্রয়োজনীয়!
কুকুর হইতে সাবধান
ওরে বাবারে! পাগলা কুকুর!
কুকুর হইতে সাবধান
বাঁচাও!
বাড়িতে ডেকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া!
তোকে না বলেছি — আমাদের কুকুরের দরকার নেই। শেষে কিনা অফিসের সাহেবকেই কামড়াতে গেলো! এখুনি তাড়া এটাকে!
বুঝলি ভোঁদা! আমি পিসেমশাইকে প্রমাণ করে দেখাবো, যে সত্যি আমাদের কুকুরের দরকার আছে কি না! চল, সিঁদ কাটিয়েদের পাড়ায় গিয়ে এমন কাহিনী বলবো, দেখবি কি রকম হাতে হাতে ফল ফলবে!
শোন ভোঁদা! পিসেমশাই বিছানার তলায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছে!
বলিস কি রে!
শুনলে!

বাড়ি ফিরে
আমিই মোকাবিলা করি!
ঠক! ঠক!
তোমার পিসেমশাই আছেন? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই!
অ্যাই মরেচে! পুলিশকে অ্যাটাক!
বাঁচাও! হেল্প! সরাও না তাড়াতাড়ি!
আয় বলছি হতচ্ছাড়া!
গররর!
সাংঘাতিক কুকুর! আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা পাগলা কুকুর জন্তু রাখার অভিযোগ আনছি! আর আপনার বিছানার নীচে রাখা পঞ্চাশ হাজার কালো টাকার বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিন!
সেরেচে! সেদিন যারা আমার কথা শুনেছিলো তারা পুলিশের গোয়েন্দা!
মিথ্যে টাকার গুজব ছড়িয়ে আর একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে তুই আমাকে একটা উটকো ঝামেলায় ফেলেছিস! যদি ভালো চাস তো এখনি ওটাকে বিদেয় কর!
হ্যাঁ, পিসেমশাই! কিন্তু কোথায় গেলো ওটা?
হাঁদা, তুই চারদিকে তোর কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছিস— এ দ্যাখ!
ওঃ, আমার খাবার! তবেরে হতচ্ছাড়া কুকুর!
মচ্! মচ্!
ইস্! আগেই যদি আপনার কথা শুনতুম!
কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়ে তোর জ্ঞান লাভ হলো হাঁদা!
আজকের মাংসটা কিন্তু দারুণ হয়েছিলো!

কলে কাগজ তৈরী

পূরবী দেবী

আজকের দিনে কাগজ ছাড়া থাকা যায় কিনা কেউ চিন্তাও করে না। যদি হঠাৎ কাগজের উৎপাদন কমে যায়, তাহলেই কাগজ যে আজ নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যাবে।

মনে কর এরোপ্লেনে চড়ে বাবা, মা কোন ভিনদেশে উড়ে চলেছে। আকাশপথে কল বিকল হয়ে প্লেন মাঝ সমুদ্রে ভেঙে পড়ল। প্লেনের সব যাত্রীরা প্লেন সমেত জলের নীচে তলিয়ে গেল। শুধু দুজন ছেলেমেয়ে আর তাদের বাপ, মা কোনরকমে রক্ষা পেয়ে একটা দ্বীপে এসে উঠল। দ্বীপে গাছপালা, ফলমূল যথেষ্ট আছে। খাবারের অভাব নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবে কি করে?

কাগজ কোথায়?

চীনদেশের লোকেরা প্রথম কাগজ তৈরি করেছিল। (২নং ছবি)

কাগজে ছেলেরা লিখছে। (১নং ছবি)

কাগজের অভাবে মেঝেতে কাঠি দিয়ে কাজ চালালে তাতে আর কত বিদ্যে দেওয়া যাবে। পরের দাগটা কাটলেই সে সব তো মুছে যাবে। তাই লেখাপড়া শেখার জন্যে কাগজ চাই। এই কাগজে লিখে ছেলেপিলেরা লেখাপড়া শেখে।

কাগজ যে কেন আবিষ্কার হয়েছিল আর কার তা প্রয়োজন হয়েছিল প্রথমে, তা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু প্রথম আবিষ্কর্তা বলে চীনদেশ আজও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাইলুন নামে একজন চীনদেশের অধিবাসী বোলতা ও মৌমাছিদের চাক তৈরি করার পদ্ধতি দেখে তুঁতে গাছের কাঠ থেঁতলে কাগজ তৈরি করার উপায় আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কার করার উপায় মুসলমানরা শেখে। তাদের কাছ থেকে ইউরোপ জানতে পারে।

কাগজ তৈরী শিখেও ইউরোপে তখন বেশী কাগজ উৎপাদন হত না। যা হত সবটাই খ্রীষ্টান পুরোহিতরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ

লেখবার কাজে লাগাতো। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপার কল আবিষ্কার হয়। হাতে লেখার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি কলে কাগজ তৈরী হওয়ার ফলে, কাগজের চাহিদা ভয়ানক বেড়ে যায়।

যখনকার কথা বলছি, তখন একখানা করে কাগজ হাতে তৈরী হত। ১৭৯৯ সালে একজন ফরাসী ভদ্রলোক কাগজের কল তৈরি করেন। তাতে একটি একটি চারকোনা কাগজের বদলে কাটিমে সুতো গোটানর মত রোলারে কাগজ তৈরী হয়ে গোটাতে লাগল। কাগজের উৎপাদন বেড়ে গেল।

সেই কল ক্রমোন্নতি করে বর্তমান যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে ৬নং ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে।

কাগজ তৈরি করতে হলে প্রথমে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে হয়। তারপর

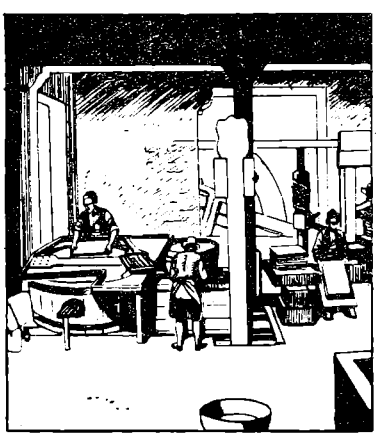

প্রথম কাগজ তৈরী একখানা করে হত। (৪নং ছবি)

খ্রীষ্টান পুরোহিতেরা কাগজে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ লিখছে। (৩নং ছবি)

সেই কাঠ কেটে টুকরো টুকরো করে কলে পাঠাতে হয়। কলে কাঠের গা থেকে তার ছালটা ছাড়িয়ে ফেলে, ছাল ছাড়ান কাঠগুলি একটি যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দেয় স্বয়ংক্রিয় ছুরির আগাতে কাঠটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই টুকরো হজমি কলে (৬নং [১) প্রচণ্ড চাপে সিদ্ধ হয়ে ছোট ছোট আঁশে পরিণত হয়। এই আঁশগুলি ধোবি যন্ত্রের (৬নং [২) মধ্যে বিধৌত হয়ে পিটুনী কলে (৬নং [৩) প্রবেশ করে। এই কলে আঁশগুলিকে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সাদা করে তার সঙ্গে মাড় ও আঠা মেশান হয়। যদি কাগজ রঙীন করতে হয় তাহলে এই কলে রঙ মেশাতে হবে। এইখানেই কাগজ তৈরীর পাল্প সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেল।

এইখান থেকে কাগজের মণ্ড বা পাল্প জর্ডন (৬নং [৪) কলে গিয়ে প্রচুর জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। এই জল-

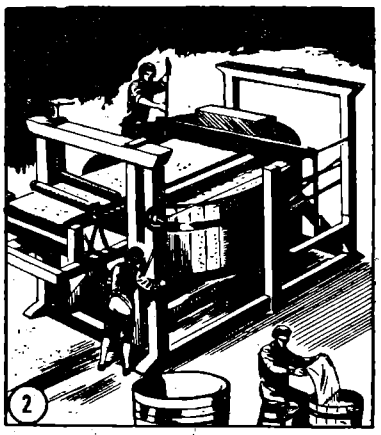

ফরাসী ভদ্রলোক কাগজের কল তৈরি করেন। (৫নং ছবি)

মিশ্রিত মণ্ডে ৯৯ ভাগ জল ও একভাগ মণ্ডের আঁশ থাকে। এই জলীয় মণ্ড পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারের জালের উপর গিয়ে পড়ে (৬নং [৫)। এই তারের জাল ক্রমাগত লম্বাকারে ঘুরেই চলচে। এই জালের গর্ত দিয়ে মণ্ডের অতিরিক্ত জল কলের নীচে চৌবাচ্চায় পড়তে থাকে আর জলবিহীন মণ্ড এগোতে থাকে জালের উপর শুয়ে। জালটি চলবার সময়ে পাশাপাশি নড়তে থাকে, তার ফলে আঁশগুলি পরস্পরের সঙ্গে চাটাই বোনার মত, একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে যায়।

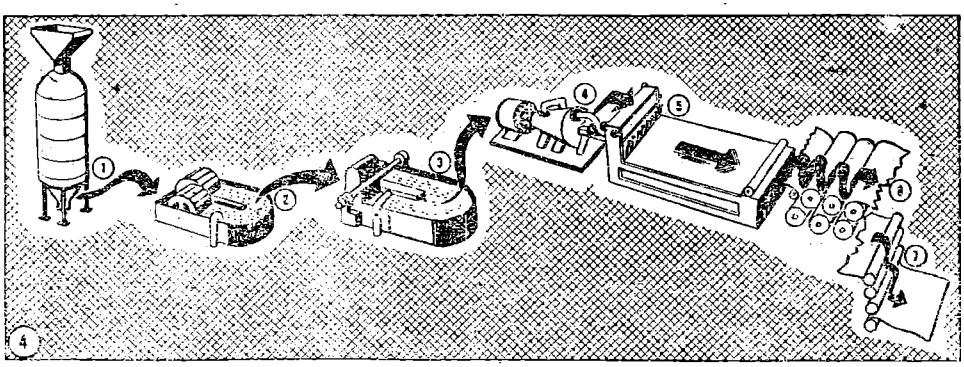

কাগজ তৈরীর বিভিন্ন ধাপ। (৬নং ছবি)

তারের জাল থেকে ভিজে কাগজ মোটা পশমের কাপড়ের উপর এসে পড়ে। এই কাপড়টা কতকগুলি রোলারের (৬নং [৬) মধ্যে দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই মোটা পশমের কাপড়ে চড়ে কাগজ সেই রোলারে প্রবেশ করে। কাগজ থেকে সব জল রোলারের চাপে বেরিয়ে কাগজ শুকনো ঝরঝরে হয়ে পালিশ কলের (৬নং [৭) মধ্যে দিয়ে মসৃণ হয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে কাগজ রোলারে গুটোতে থাকে।

কাগজ একবার তৈরী হয়ে গেলে আর ভাবনা কি। এইবার তাই প্রয়োজনমত কেটে জিনিস তৈরি করালেই হবে।

● শহীদ স্মৃতিকথা

গদরের প্রতিধ্বনি

রঞ্জন মিত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, জার্মানিতে আলোড়ন তুলেছে ভারতীয়দের গদর আন্দোলন। তার ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছে ভারতের বুকে।

কোমাগাটামরুর যাত্রীরা ভারতে ফেরার পথে বন্দরে বন্দরে ইংরেজ পুলিসের হাতে যে নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে, তার জ্বালা তুষানলের মত অনির্বাণ হয়ে আছে প্রতি ভারতীয়ের বুকে। সে-আগুনে হাওয়া দিচ্ছে গদর পত্রিকা। সানফ্রান্-সিস্‌কো থেকে প্রকাশিত হয়ে এই গুরুমুখী ভাষার কাগজখানি নিয়মিত কী জানি কোন্ গোপন পথে চলে আসছে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলছে দলিত ভারতবাসীকে।

বজবজ স্টেশনে কোমাগাটামারুর যাত্রীদের জোর করে ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা সবাই ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। পাঞ্জাবের সীমায় পৌঁছোবার আগে কাউকেই আর ট্রেন থেকে নামতে দেওয়া হয় নি। পৌঁছোবার পরে তাঁদের করা হল অন্তরীণ, কাউকে নিজের বাড়িতে, কাউকে বা অন্যত্র।

যাহোক, সুযোগ সুবিধামত এই অন্তরীণ ব্যক্তিদের পক্ষে স্থানীয় আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব ছিল না, এবং বলাই বাহুল্য, সেই যোগাযোগের ফলে ইংরেজ বিদ্বেষ ঠিক দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল পঞ্চনদের প্রতি অঞ্চলে। "এ অত্যাচারের প্রতিশোধ আমরা নেব"—জনে জনে শপথ নিল গ্রন্থসাহেবের নামে।

চিন্তার ধারা যাদের এক খাতে বইছে, সংঘবদ্ধ হতে তাদের বেশী সময় লাগে না। গ্রামে গ্রামে দেশপ্রেমীরা বিপ্লবের জন্য তৈরী হচ্ছে, শহরে শহরে খসড়া এসে গিয়েছে আসন্ন কর্মসূচীর। ছাউনিতে ছাউনিতে অনুপ্রবেশ করছে সংঘের কর্মীরা। সিপাহীদের মধ্যে বিতরণ করে আসবে গদর পত্রিকা, প্রেরণা যোগাবে রাজদ্রোহের। রাজা? কিসের রাজা সে? ঐ বিদেশী ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ? যে লোকরঞ্জনের দায়িত্ব স্বীকার করে না, সে আবার রাজা কিসের? পশুবলে যে শাসন করতে চায় একটা সভ্য জাতিকে, সে ত নিজেই পশু। তাকে তাড়ানোতে পাপ নেই, সহজে না গেলে, তাকে বলি দেওয়াতেও নেই অন্যায়।

মিয়ানমির, জলন্ধর, থান্নু, কোহাট, নওশেরা, রাওলপিণ্ডি, কপূরথালা—শহরে শহরে সামরিক ছাউনি। ফিরোজপুর, মীরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বানারস,

হরনাম সিং

ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আম্বালায় অতিকায় সব ব্যারাক। ছোট-বড় কোন জায়গায়ই বাদ না দিয়ে বিপ্লবীরা হানা দিতে লাগল প্রতি স্থানে।

জমিন কতকটা তৈরী হয়ে এল যখন, বাইরে থেকে বোমা সরবরাহ হতে লাগল, ছাউনির অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। বিষ্ণু গণেশ পিংলে মার্কিন মুলুকের কর্মী ছিলেন গদর পার্টির। তিনি এখন পাঞ্জাবে। সুযোগ্য সহকারী কর্তার সিং আর হরনাম সিংকে নিয়ে তিনি অকুতোভয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘাঁটি থেকে ঘাঁটিতে—"ওঠো, রুখে দাঁড়াও ভারতের সৈনিক! স্বাধীনতার যুদ্ধে অস্ত্রধারণের আহ্বান নিয়ে এসেছি আমরা"—এই তাঁদের বাণী।

এই ব্যাপক আয়োজন, এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা, এ-সবের মূলে কিন্তু যে-লোকটি, কোন ছাউনির কোন সৈনিক তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পায় নি কোনদিন। সর্বত্রই তিনি আছেন, কিন্তু ধরাছোঁয়ার ভিতরে তাঁকে পাওয়া, পুলিসের পক্ষে ত বটেই, তাঁর নিজের অনুগামীদের পক্ষেও অসম্ভব। অবশ্য প্রয়োজনবোধে পরিচয় দিতে তাঁর দ্বিধা নেই। ভয়ডর সংকোচের অতীত তিনি।

পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবীরা তাঁকে জানে সতীনূর চন্দর বলে। কেউ কেউ ডাকে মোটাবাবু সম্বোধনে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে, নানা নামে তিনি পরিচিত হয়েছেন বিপ্লবী-সমাজে।

কিন্তু তাঁর আসল নাম?

আসল নামটি তাঁর ভারতবাসীর জপের মন্ত্র হয়ে থাকবে চিরদিন। সে-নাম রাসবিহারী। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুই ছিলেন পাঞ্জাবজোড়া ঐ মহান্ উদ্যোগের পুরোধা। আজ এখানে, কাল ওখানে। যেখানে যখন প্রয়োজন সতীনূর চন্দরকে সেই মুহূর্তেই পাওয়া যাবে সেখানে।

ঝঞ্ঝার মত দুর্বার গতি তাঁর। কর্মকৌশল আর উপস্থিত বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় তিনি। তাঁর আশেপাশে ডজনে ডজনে মানুষ ধরা পড়ছে পুলিসের হাতে, দিন গুনছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, কিংবা হয়ত ফাঁসিতেই ঝুলছে—বন্দে মাতরম্ গানে প্রভাত-গগন ঝংকৃত করে। কিন্তু দীর্ঘদিনের বিপ্লবীজীবনের ভিতর রাসবিহারীকে কোনদিন গ্রেফতার করতে পারে নি ইংরেজের পুলিস।

বৈদেশিক সাহায্য? নিতে হবে বই কী? স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহ পতাকা উড়িয়ে দেবার পরে পরাধীন জাতিমাত্রকেই বিদেশী কোন সরকার বা বিদেশের কোন সহানুভূতিশীল প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হতেই হয়। এমন যে অতিপরাক্রান্ত মার্কিন রাষ্ট্র, তাকেও ফরাসী জনগণের সাহায্য নিতে হয়েছিল, ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য।

পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা মুক্ত হস্তে সাহায্য পেয়েছিলেন জার্মানি থেকে। না, জার্মান রাষ্ট্রের কাছ থেকে নয়, সে রাষ্ট্র তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জাঁতাকলে পড়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বিব্রত। সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল প্রবাসী কতকগুলি মহানুভব জার্মানির কাছ থেকে, যাঁরা নাম ধাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁরা দিয়েছিলেন প্রভূত অর্থ। তাঁরা পাঠিয়েছিলেন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সব অস্ত্র সমুদ্রপথে আসার সময় ইংরেজের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তল্লাশি করে ওরা সবই প্রায় বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল।

তবু, যা হোক করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলল। প্রথমতঃ লুঠ করা হবে, প্রতি জেলা শহরের সরকারী কোষাগার। কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থান পেয়েছে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। যেখানে যত ছাউনি আছে, সেখানে অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে স্থানীয় সিপাহীদের, বাইরে থেকে বিপ্লবীরাও অবশ্য সাহায্য করবে বই কি!

তৃতীয় পর্যায়ে গেরিলা যুদ্ধ। আকস্মিক হানা দিয়ে রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া, সেতু বিধ্বস্ত করা, ইংরেজের তৈরি বিরাট কেরানীখানাগুলো বোমায় গুঁড়িয়ে দেওয়া। এই সব কাজে সাফল্যলাভ করতে পারলে একদিকে ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল হবে, অন্যদিকে মনোবল বৃদ্ধি পাবে পদদলিত জনসাধারণের।

শেষ পর্যায় হল সম্মুখযুদ্ধ, কিন্তু তার স্বপ্ন এখন দেখছে না কেউ। তার এখনও দেরি আছে। প্রথম তিনটি পর্যায় সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করে যেতে পারলে তবেই চিন্তা করা যাবে মুখোমুখি লড়াইয়ের কথা।

প্রথম জমায়েত হল ঝাড়-সাহিব নামক স্থানে। ১৯১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর। এখানে ২৩ সংখ্যক অশ্বারোহী বাহিনীর কিছু বিদ্রোহী সৈনিকও এসে যোগ দেবার কথা

ছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্রেস জ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য তৈরীও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ ছাউনির ভারপ্রাপ্ত সেনানী মেজর স্কট ক্যাম্বেল কী যেন একটা খবর পেয়ে গেল গোপন সূত্রে। অসময়ে গেট বন্ধ করে পাগলাঘন্টি বাজিয়ে দিল, ব্যারাকে ব্যারাকে সিপাহীদের মাথা গুনতির জন্য।

হল না আর বিদ্রোহী জোয়ানদের বেরুনো। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার লজ্জা, আর শেষ মুহূর্তে মাতৃসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মর্মবেদনা, দুটোয় মিলে তাদের নৈরাশ্যে অভিভূত করে ফেলল।

সৈনিক ও বিপ্লবীদের মিলিত বাহিনীর অভিযান করার কথা ছিল সারাহলি পট্টি ও তরনেত্রাণ অভিমুখে। সেখানকার ট্রেজারি ছিল লক্ষ্য, কিন্তু সৈনিকেরা আটকে পড়েছে শুনে বিপ্লবীরা সতর্ক হয়ে গেল। কী জানি লক্ষ্য স্থানেও হয়ত কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে! সূচনা অশুভ দেখে উদ্যোগটাই আপাততঃ বন্ধ রাখলেন অধিনেতা কর্তার সিং।

মোগা শহরের কোষাগার ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন! এইটিই ছিল কর্মসূচীর ২নং উদ্যম। ২৭শে নভেম্বর অভিযাত্রীরা সমবেত হল পূর্ব নির্দেশমত। যাত্রা শুরু হল ফিরোজশহরের দিকে। সেইখানেই একটা পুলিস ফৌজ গতিরোধ করল তাদের। কী জানি, এবারও হয়ত কোন বেইমান খবর দিয়ে দিয়েছিল তাদের।

যা হোক, যাত্রা বন্ধ করে ফিরে যাওয়ার কথা এবার মনেও হল না কারও, মনে হলেও সে মতলবকে কাজে পরিণত করার কোন উপায়ও ছিল না তখন। পুলিস ত শুধু তাদের গতিরোধ করবার জন্যই আসেনি! তারা এসেছে যখন, বাহুবলের পরিচয় দেবেই খানিকটা। তারা গুলি চালাল।

গুলি কাজেই এদিক থেকেও চলল। আধঘণ্টা বুলেট বৃষ্টির ফলে ওদিকে নিহত হল দুইজন, এদিকে দুইজন। ওদিকে মৃত্যুবরণ যারা করল, তারা পদস্থ অফিসার একজন ইনস্পেক্টর, আর একজন জেলদার। তারপর দুইদলই পশ্চাৎপদ হল।

মাসখানেক চুপচাপ থাকার পরে এবার বিস্ফোরণ ঘটল লুধিয়ানার মানসুরাম ও সানেওয়াল গ্রামে। ২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারি। তারপর মালেরকোটলা রাজ্যের ঝেনার শহরে, সেটার তারিখ ঐ মাসেরই ২৯শে। তারপর ২রা ফেব্রুয়ারি অমৃতসরের নিকটবর্তী ছাবায় এবং ৩রা ফেব্রুয়ারি লুধিয়ানার রাভোনে।

এসব জায়গায় লুণ্ঠন চলেছিল সরকারের অনুগৃহীত জমিদার ও খেতাবধারী ধনীদের প্রাসাদে। সংগৃহীত হয়েছিল প্রচুর অর্থ, কিন্তু একবিন্দু রক্তপাতও হয়নি কোনস্থানে। কিন্তু ব্যতিক্রম হল আনারকলি বাজারে। সেখানে আক্রমণ চালাতে

গিয়ে পুলিস প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল। মারা পড়ল একটা পুলিস দারোগা। আর আততায়ীও পড়ল ধরা। পরে তার ফাঁসি হয়েছিল।

কপূরতলা অস্ত্রাগার লুঠ, লাহোর ও মণ্টগোমারি জেল আক্রমণ করে তা থেকে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, রেলওয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভল্লা সেতু উড়িয়ে দেওয়া, প্রায় এক মাসেই এইগুলিতে হাত দেওয়ার কথা বিপ্লবীদের। এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরী বিবেচিত হল সেতুটারই ধ্বংস, অভিযান শুরু হল ১২ই জুন, ১৯১৫।

বিষ্ণু গণেশ পিংলে

ভল্লা সেতুর উপরে আক্রমণ হতে পারে—এ আশঙ্কা রেল ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষেরও ছিল। তাই তারা আগে থাকতেই একদল সৈনিক মোতায়েন রেখেছিল ঐ সেতু রক্ষা করবার জন্য। বিপ্লবীরা তাতে ভয় পেল না, বীর বিক্রমে চড়াও হল ব্রিজের উপরে। বাধল লড়াই। সৈনিক নিহত হল চারজন, সেতু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল খুবই, যার ফলে সাতদিন ওপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রইল।

এর পর ধ্বংস করার কথা ছিল দরহা সেতু। কিন্তু সরকার আগে থাকতে সেখানে এনে ফেলল পুরো একটা পলটন। সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়ার মত শক্তি এখনও সঞ্চয় করতে পারে নি বিপ্লবীরা। পিংলে, কর্তার সিং, হরনাম সিং মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন—দরহার অভিযান আপাততঃ পরিত্যক্ত হোক।

পরিত্যাগ করতে হল মণ্ডিরাজ্যের পরিকল্পিত অভ্যুত্থান। সেখানে একটা প্রজা-বিদ্রোহ ঘটিয়ে তোলার তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়েছিল। বাইরে থেকে বোমা, বারুদ, বন্দুক যোগাবে বিপ্লবীরা। স্থানীয় লোকেরা করবে লড়াই, এই রকমই স্থির ছিল। উজির নিহত হবে, এবং নিহত হবে ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক অফিসারও—রাজ্যটাই স্বাধীন হয়ে যাবে, এইরকম আশা করেছিল কর্তার সিং।

কিন্তু তা হল না। মণ্ডির বিপ্লবকর্মীরা শেষ মুহূর্তে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল, নেতৃত্বের লড়াই উপলক্ষ্য করে। প্রকাশ হয়ে পড়ল সব কথা। পাঁচজন নায়ক ধৃত হল রাজদ্রোহী বলে।

কখনও সাফল্য, কখনও ব্যর্থতা, এরই মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের [illegible] চন্দরের পরিকল্পিত পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে। দেশজোড়া একটা অভ্যুত্থান করাতে পারলে কোন দিকেই আর সুবিধা হবে না। টুকরো টুকরো উদ্যম অনেকেই [illegible] ইংরেজ সরকার তা অনায়াসেই দমন করে। সুতরাং এবার এক সাথে সব শহরে, বড় বড় গ্রামে পর্যন্ত বাধিয়ে দেওয়া যাক গেরিলা যুদ্ধ। কত জায়গায় সৈন্য পাঠাবে সরকার?

ধরে নেওয়া যাক, এই দেশব্যাপী অভ্যুত্থানও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। কিন্তু সে-ব্যর্থতারও কোন সার্থকতা নেই কি? ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, যাকে [illegible] ঐতিহাসিকেরা নাম দিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ, ব্যর্থ হয়েও কি তা চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর পক্ষে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায় নি?

হয় যদি এবারও ব্যর্থ হোক! বিফলতার বহু স্তম্ভের উপর সফলতার সৌধ একদিন গড়ে উঠবে। ভারত হবেই স্বাধীন।

দিন স্থির হল ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

সারা পাঞ্জাবে আলোড়ন সেদিন! লাহোরে, অমৃতসরে, জলন্ধরে, লুধিয়ানায় ত বটেই, অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ শহরে, এমন কি বহু বহু গণ্ডগ্রামেও মুখোমুখি [illegible] সেদিন। জনতার সঙ্গে সরকারী পুলিস আর মিলিটারীর। জনগণের পরাজয় শেষ পর্যন্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিপ্লবের আগুন একবার যা দেশবাসীর অন্তরে অন্তরে জ্বলে উঠল সেদিন, তা স্বাধীনতা লাভের আগে আর কোন শান্তি প্রলেপেই নির্বাপিত হল না।

বিভিন্ন স্থানে, বিদ্রোহীদের সক্রিয় পরিচালনায় রত-অবস্থায় বন্দী হল সাতজন বিপ্লবী নেতা, তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল বর্বর বিদেশী সরকার। সে সাতজন হল বিষ্ণু গণেশ পিংলে, হরনাম সিং, কর্তার সিং, বকশিষ সিং, জগৎ সিং, সুরাইন সিং-১ ও সুরাইন সিং-২।

মৃত্যু? মৃত্যুকে জয় করে সেই অমর শহীদেরা আজও ভারতবাসীর অন্তরের পূজা লাভ করে আসছেন, নবভারতের দেবতা বলতে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদগণকেই বুঝি।

———

ডাকাতের যম ঢেঁকি

অম্বুজেন্দ্র ঘোষ

নাম শুনে নিশ্চয়ই চমকে উঠছ তোমরা। ভাবছ কোন ঢেঁকির গল্প শোনাব বুঝি তোমাদের। আসলে তা মোটেই নয়। ঢেঁকির কথাও নয়, রূপকথাও নয়, বরং তোমাদের কাছে বলব প্রকাণ্ড এক মানুষের কথা—সারাটি জীবন ধরে মহাবিক্রমে যিনি অসাধ্য সাধন করে প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন এক সময়।

শান্তিপুরে কেউ গিয়েছ তোমরা? কলকাতা থেকে মাত্র আটান্ন মাইল দূর। কু-ঝিক্ ঝিক্ ট্রেনে করে ঘণ্টাদুয়ের মধ্যেই পৌঁছোন যায় সেখানে। সেই শান্তিপুরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এক সরল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন সেই মহাশক্তিধর মানুষটি। নাম তাঁর আশানন্দ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য লোকে তাঁকে বলত—আশানন্দ ঢেঁকি। কেন বল ত? আচ্ছা, শোন সেই কথা।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, একসময়ে ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাতে এ দেশে পথে ঘাটে চলাফেরা করা পর্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। কোথাও কোন ট্যাঁ-ফুঁ-টি নেই, দিনদুপুরের ভয় ডর নেই—হঠাৎ 'হারে রে-রে-রেরে' হেঁকে ডাকাতেরা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত কোন গৃহস্থের বাড়িতে বা নিরীহ পথিকের উপরে। তারপর মারধর করে সব লুটপাট করে নিয়ে তারা উধাও হত চোখের নিমেষে। রবি ঠাকুরের 'বীরপুরুষ'এর সেই দুঃসাহসী খোকার মত কারুর বলার সাধ্যটি ছিল না—'দাঁড়া খবরদার! এক পা কাছে আসিস যদি আর,...' বরং ঝাঁকড়া মাথা ডাকাতদের দেখলেই ভয়ে গলা শুকিয়ে কাট হয়ে যেত অনেক জোয়ান মানুষেরও। যাই হোক, এমনি যখন অবস্থা তখন আশানন্দ হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড করে চমকে দিলেন সবাইকে। সেদিন একটা মাত্র পাইক সঙ্গে নিয়ে আশানন্দ চলেছিলেন জমিদারের খাজনা দিতে। পথের মাঝে প্রায় দুশো ডাকাত ওত পেতেছিল সেই টাকা ছিনিয়ে নেবে বলে।

গণ্ডীর মধ্যে পা দিতেই ঝপাং করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল আশানন্দের টাকার থলের উপরে। আর যায় কোথা! মহাবীর আশানন্দ গেলেন ক্ষেপে। তবে রে! একাই তিনি এমন বেধড়ক মার দিলেন যে ডাকাত বাবাজীরা পালাবার পথটি পেল না।

প্রচুর ভোজন করতে পারতেন আশানন্দ। দুবেলা ডাম্বেল-বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করতেন, সাঁই সাঁই করে মুগুর ঘোরাতেন মাথার উপর। ফলে তাঁর দেহে প্রায় মধ্যম পাণ্ডবের মত শক্তি জন্মেছিল, ভয় ডরের বালাই ছিল না আশানন্দের মনের মধ্যে,

ঢেঁকি মাথায় তুলে নিয়ে ডাকাতদের সামনে এসে লড়াই করে।

অথচ তাঁর মত সৎ, সাদামাটা মানুষটি পাওয়াও ছিল দুলভ। সৎ ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর রাগ জন্মেছিল পৃথিবীর যাবতীয় অসৎ কাজকর্মগুলোর উপরে। ডাকাতি করা তো চরম অসৎ কাজ বটেই।

একবার কি হয়েছে শোন, বলি। সদর থেকে সেবারও খাজনার টাকা জমা দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন আশানন্দ। পথে আসতে আসতেই পাখীদের ডানায় ভর করে হঠাৎ নেমে এল সন্ধ্যা, ঘুটঘুটে আঁধারে পা ফেলা দায়। অতঃপর রাত কাটাতে অতিথি হয়ে উঠলেন এক বড়লোকের বাড়িতে। হায়রে কপাল! আশানন্দের এমনই ভাগ্য যে সেই রাত্রেই সেই বাড়িতে আচমকা ডাকাত পড়ল। ডাকাতদের বিশাল বিকট চেহারা দেখে গৃহস্বামী ভদ্রলোক তো ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতে আশানন্দকে জড়িয়ে ধরল। কাঁচা ঘুমে ঘা পড়াতে আহত সিংহের মত আশানন্দের মাথাতেও তখন খুন চেপেছে। রাগে তাঁর শরীরের রক্ত রিনরিন করে উঠল যেন। হাতের কাছে কোনরকম অস্ত্র না পেয়ে তিনি ছুটলেন উঠোনের দিকে। উঠোনের পাশেই ঢেঁকিশালা থেকে প্রকাণ্ড একটা ঢেঁকি মাথায় তুলে নিয়ে ডাকাতদের সামনে এসে লড়াই করে, আর বেশ ঘা কতক দিয়ে তাদের দূর করে দিলেন তিনি। নিরেট ঢেঁকির ঠ্যাঙানি খেয়ে বাছাধনেরা আর ঘাড়টি পর্যন্ত ফেরাল না। এক পলকেই পগার পার। আশানন্দের তখন মহানন্দ। দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে।

যে [illegible] বুড়ো আর ডাকাতদের দ্বারা নির্যাতিত মানুষজন গালে [illegible]—[illegible], এই না হলে সাহস, এই না হলে বিক্রম! সেই সেদিন থেকেই [illegible] নাম হয়ে গেল—আশানন্দ ঢেঁকি।

[illegible] এমনই কত অসংখ্য বীরের স্মৃতি ধূসর হয়ে আছে সাময়িক আন্দোলনের অন্তরালে। খুঁজলে তোমরাও নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে সেই কীর্তিকাণ্ডের অনেক অবহেলিত তথ্য। আশানন্দের কাহিনীই বা আমরা ক'জন খবর রাখি বল! অথচ ১৩৩৯ সালে শান্তিপুরের গর্বিত লোকেরা তাঁরই বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশানন্দ স্মৃতিস্তম্ভ। সেই স্তম্ভ গাত্রে আজও লেখা আছে—

> দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে
> সুমহান ব্রত যার ছিল এ জীবনে,
> মুখো-বংশে অবতীর্ণ আশানন্দ বীর,
> 'ঢেঁকি' নামে খ্যাত যিনি বক্ষে পৃথিবীর,
> প্রবাদ হয়েছে এবে গরিমা যাঁহার
> তাঁহারি এ স্মৃতিস্তম্ভে কর নমস্কার!

তোমরা যদি কখনও সেখানে যাও তবে সেই স্তম্ভ গাত্রে মাথা ঠেকিয়ে ধন্য হতে ভুলো না যেন।

প্রেসিডেন্টের বাড়ি—

ছবিতে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সে বাড়িতে এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন বাস করেন। নিকসনের পর যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন ভবিষ্যতে তিনিও এই বাড়িতে বাস করবেন।

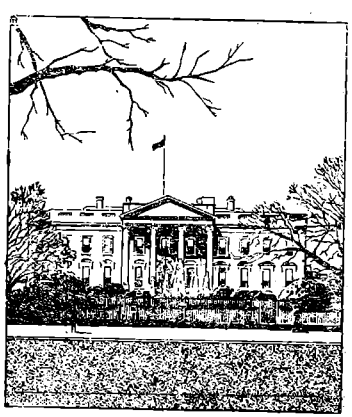

"৺সুব্রত দাশগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

শাপমোচন

অলক চক্রবর্তী

পৃথিবীতে তখন দ্বাপর যুগ চলছে। সবে শেষ হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। একদিকে অশ্রু ঝরছে, যুদ্ধে হেরে যাওয়া কৌরব পক্ষের নামেমাত্র বেঁচে থাকা বন্ধুবান্ধবগণের চোখ থেকে আর অপরদিকে বিজয়ী পাণ্ডব পক্ষ তখন বিজয়োল্লাসে মত্ত। প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির তখন হস্তিনাপুরের নতুন রাজা। উত্তর-পশ্চিম উত্তর প্রদেশে—দিল্লীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ছিল তখনকার 'হস্তিনাপুর রাজ্য'। দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তিনি আয়োজন করেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞের।

* * *

এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সে যুগে রাজাদের মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সাম্রাজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধির—অর্থাৎ এক কথায় সম্রাট্ উপাধি লাভের একমাত্র উপায় ছিল ঐ অশ্বমেধ যজ্ঞ। ঐ যজ্ঞের নিয়মানুসারে যজ্ঞের পর একটি মন্ত্রপূতঃ ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হতো—আর ঐ ঘোড়া আপন ইচ্ছানুযায়ী দেশ-বিদেশের নানা পথ পরিক্রমা করে স্বদেশে ফিরে আসতো। তার পিছু পিছু থাকতো সে দেশের সামরিক বাহিনী। যে সব দেশের ভিতর দিয়ে ঐ ঘোড়া ফিরে আসতো সে সব দেশের রাজারা ঐ রাজাকে সম্রাট বলে মেনে নিতেন। আর যারা ঐ রাজাকে সম্রাট বলে স্বীকার করতে রাজী হতেন না, তাঁরা স্বদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঐ ঘোড়াকে আটক করতেন। তখন ঘোড়ার পিছু পিছু আসা সৈন্যদের সাথে তাদের যুদ্ধ বেধে যেত। যুদ্ধে হেরে গেলে ঐ ঘোড়াকে মুক্ত করে দিতে হতো—তাদের ঐ রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে হতো। আর ঘোড়ার সাথে আসা সৈন্যরা পরাস্ত হলে বিফল হতো, তাদের ঘোড়াকে মুক্ত করার চেষ্টা—বিফল হতো তাদের রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ।

* * *

যাক্, যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। বিরাট যজ্ঞের পর মন্ত্রপূতঃ যজ্ঞাশ্ব নিয়ে বেরুলেন সেনাপতি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। সাথে তাঁর অগণিত সৈন্য; আর রয়েছেন দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীম, শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন, কর্ণনন্দন বৃষকেতু প্রমুখ বীরগণ। গোটা

বিশ্বে অতুলনীয় [illegible] নাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কি যুদ্ধই না দেখিয়েছেন তিনি —কত অসহায়কে সহায় করেছেন—কত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকেই হার মানিয়েছেন তিনি।

[illegible] ছুটলো, ঘাড় ফুলিয়ে মনের আনন্দে সে চলতে লাগলো— কখনো সোজা, কখনো ডানে, কখনো বামে, কখনোও বা জনপদ দিয়ে, আবার কখনো বা বনপথ দিয়ে। এমনিভাবে একদিন সে ছুটছে ঘন অরণ্যের অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে—মনের খেয়ালে সে বাঁক ফিরল ডান দিকে—চলতে লাগলো হর্ষান্বিত চিত্তে। চলছে তো চলছে। হঠাৎ সে দেখলো তার সামনে পড়ে আছে একটি পাথর। বল দেখলেই যেমন আমাদের লাথি মারতে ইচ্ছে করে, ঘোড়াটিরও তেমনি পাথর দেখেই গা চুলকাতে শুরু করলো; আর ঐ চুলকানো সারাতে সে পাথরে ঘষতে শুরু করলো তার শরীর। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওর চুলকানোর জ্বালা ফুরলো, এবার সে চলবে,—কিন্তু সে যে ছুটতে পারছে না! পাথরটি যেন চুম্বকের মত আটকে রাখলো তাকে। ভীম, প্রদ্যুম্ন এরা সবাই স্তম্ভিত— কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্তম্ভিত সেনাপতি অর্জুনও। কিন্তু তাঁকে তো বসে থাকলে চলবে না— কাঁধে তাঁর ঘোড়া মুক্ত করার গুরুদায়িত্ব। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে অনেক বিপদের, অনেক অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হলেও, এমন অলৌকিকতার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। কেমন করে ঘোড়াকে মুক্ত করবেন—ঐ পাথরটিই বা কেমন করে ঘোড়াকে আটকে রাখলো—এসব নানা ভাবনায় ভাবাতুর অর্জুন সেখানেই ছাউনি ফেললেন।

শুরু হলো সবাই মিলে পরামর্শ। তাঁরা সামনে দেখতে পেলেন অপূর্ব এক তপোবন। প্রদ্যুম্নের পরামর্শে অর্জুন প্রমুখ জনাকয়েক তপস্বীর উদ্দেশ্যে ঐ তপোবনের দিকে চললেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন শিষ্য পরিবৃত হয়ে বসে আছেন মুনি। অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন এগিয়ে গেলেন—যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে নিবেদন করলেন মুনির কাছে,— যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে শুরু করে পাথরের ঘোড়া আটকে রাখা পর্যন্ত আগাগোড়া সব ঘটনা। তাঁর পরামর্শ চেয়ে অর্জুন বললেন—"মহামুনি, কি করে এ অবস্থায় ঘোড়াকে মুক্ত করতে পারি, দয়া করে সে পথটা বাৎলে দিন না।" মুনি তো শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জুনকে দেখে মহাখুশী; তিনি অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বললেন—"মাভৈঃ, পাষাণের হাত থেকে তোমার এ ঘোড়া মুক্ত হবেই। এ পাথর সত্যিকারের পাথর নয়। তোমারই অনুস্পর্শের আশায় এ পাথর অনেক দিন ধরে চাতক পাখীর মত উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করছে—এ পাথর ব্রহ্মশাপে স্বরূপ হারানো এক নারী।"

অর্জুন তো অবাক্। কিন্তু কারো কথায় তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করে ফেলবার পাত্র তিনি নন। তিনি ধীমান্। তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তিনি মুনিকে সব খুলে বলতে অনুরোধ জানান।

মুনি দ্বিরুক্তি না করে এক নাগাড়ে বলে চললেন—"শুনতে এখন চাইছো, তবে বলি শোন। অনেকদিন আগে এই বনেই উদ্দালক নামে এক মুনি বাস করতেন। তপোবনে তাঁর সাথে থাকতেন তাঁরই পত্নী চণ্ডিকা দেবী। চণ্ডী ছিলেন নিতান্তই কিশোরী। বাল্য-বিবাহ প্রথানুসারে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। যাহোক 'স্বামী পত্নীর গুরু'—অন্ততঃ সেকালে এ নিয়মই ছিল। কিন্তু চণ্ডী উদ্দালককে বিন্দুমাত্র সমীহ করতেন না। উদ্দালক তাঁকে যা করতে বলতেন তিনি করতেন ঠিক তার বিপরীতটি। উদ্দালক যদি তাঁকে বলতেন—"কমণ্ডলুটা আন তো, আমি এখন যজ্ঞে বসছি।" চণ্ডীর কাছ থেকে সাথে সাথে জবাব আসতো—"কমণ্ডলু আমি আনতে পারবো না—যজ্ঞেটজ্ঞে কোন কাজ নেই।" উদ্দালক যদি তাঁকে বলতেন—"এখন খেয়ে ফেলগে যাও।" মুখের উপর তিনি উত্তর দিয়ে বসতেন—"আজ আমি জলগ্রহণও করছি না, আজ আমি উপোস করব।" আর সত্যি সত্যি করতেনও তাই। উদ্দালক যদি বলতেন—"ভাতটা পাকিয়ে নাও।" চণ্ডী ঐভাবে না-বোধক কোন একটা উত্তর দিয়ে সেদিনের মত উনুনে হাঁড়ি চাপানো থেকে বিরত থাকতেন।

উদ্দালক নানাভাবে তাঁকে বুঝাতেন। অনেক উপদেশ ও নীতিকথাও তিনি তাঁকে শুনাতেন। কিন্তু তাঁর ঐ সবই ছিল ফুটো কলসীতে জল ঢালার শামিল। কোন ফলই তিনি পান নি। তাই তাঁর মনে ছিল ভীষণ দুঃখ। অনেক সময় সে দুঃখ চেপে রাখতে না পেরে তিনি তাঁর প্রতিবেশী মুনি-পত্নীদের সে সব কথা বলতেন। তাঁরা তাঁকে শান্ত করে চণ্ডীর কিশোরী হৃদয়ের দোহাই দিয়ে, কিছুদিন ধৈর্য ধরে সহ্য করতে উপদেশ দিতেন। উদ্দালক ভাবতেন সত্যি বোধ হয়, কিশোরী হৃদয়ের বেয়াড়াপনা একদিন ঠিক হয়ে যাবে—তিনি সুখী হবেন। কিন্তু কই—বছরের পর বছর যায় কিশোরী চণ্ডী এখন তারুণ্যের গণ্ডী অতিক্রম করতে পা বাড়াচ্ছে—তবু স্বভাবের বা মেয়েলের বেয়াড়াপনায় বিন্দুমাত্র কমতি নেই; বরং দিন দিন সেগুলো বেড়েই চলছে। উদ্দালক তবু ধৈর্য ধরে আছেন—ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে।

প্রথমতঃ উদ্দালকের অসুবিধে হলেও, এখন আর বিশেষ অসুবিধে হয় না। কারণ 'প্রয়োজনই আবিষ্কারের জনক।' আর চুঁশ খেতে খেতে এখন তাঁর হুঁশও হয়ে গেছে; এখন তিনি চণ্ডীকে সঠিক পথে পরিচালনা করার একটা বিকল্প পথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এখন চণ্ডীর কাছে জল চাইতে হলে তিনি ঘুরিয়ে বলেন—"এ পাত্রটা শূন্য রইলো, দেখো এতে জল ঢেলে দিও না কিন্তু।" চণ্ডীকে খাওয়ার কথা বলতে হলে তিনি এখন বলেন—"দেখো আজ অমুক ব্রত, তুমি উপোস করবে কিন্তু।"

এভাবে উদ্দালক মুনি তাঁর ঘরোয়া জীবন চালিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় একদিন মহামুনি কৌণ্ডিল্য তাঁর শিষ্যবর্গসহ উদ্দালকের তপোবনে এসে উঠলেন। উদ্দালক আগে

থেকেই হয় [illegible] তাকে বললেন—"ঐ যে ঋষি কৌণ্ডিল্য আসছেন—তুমি তাকে সাদর জানাবে, এমন কি তাকে সম্ভবত জানবে না [illegible] চণ্ডী তৎক্ষণাৎ কৌণ্ডিল্যকে সাদর [illegible] প্রতিজ্ঞা করে বসলে, পাদপ্রক্ষা-লনের জল ইত্যাদি নিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হলেন।

পাথরের জায়গায় উঠে দাঁড়ালেন এক নারীমূর্তি।

যাক, কৌণ্ডিল্য উদ্দালকের তপোবনে অতিথি হলেন। তখন উদ্দালক, একদিন কৌণ্ডিল্যকে তাঁর সকল কথা খুলে বললেন। ইতিমধ্যে উদ্দালকের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হলো। কিন্তু চণ্ডীর ভয়ে উদ্দালক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে কৌণ্ডিল্যের পরামর্শে তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সকালবেলা তিনি চণ্ডীকে ডেকে কৌণ্ডিল্যের সামনেই বললেন—"আজ আমার পিতৃশ্রাদ্ধ…।" চণ্ডিকা সাথে সাথে জবাব দিয়ে বললেন—"আমি কিছু পারবো না—ছেরাদ্দের কোন প্রয়োজন নেই।" স্বামীর কথার-উপর এভাবে প্রত্যুত্তর করতে দেখে কৌণ্ডিল্য তো ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। আরক্ত লোচনে তিনি চণ্ডীকাকে বললেন—"হে পাপী, নারীর চির-আরাধ্য স্বামীর সাথে তোমার এই ব্যবহার! আমি তোমায় অভিসম্পাত করছি, তুমি এখনই শিলারূপে প্রাপ্তা হও।"

এতদিনে চণ্ডীকার যেন সংবিৎ ফিরে এল। সত্যিই, তিনি যে পাপী! কিন্তু এখন আর সময় নেই। বিপদ এখন সুনিশ্চিত। তাই সে বিপদের প্রতিবিধান করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। সে কর্তব্যে চণ্ডীকা অবহেলা করলেন না। কৌণ্ডিল্যকে তিনি শুধালেন—"এতদিনের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে—আপনি আমায় যোগ্য শাস্তিই দিয়েছেন। কিন্তু কবে, কখন আর কিভাবেই বা আমি এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত হতে পারি?"

কৌণ্ডিল্যের ক্রোধ তখন ভাঁটিমুখে। উত্তেজনায় কি ঘটেছে, এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি উত্তরে বললেন—"চণ্ডিকা, তুমি কিছুকাল বনে গিয়ে বাস কর। কালে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন; আর সে যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে বেরুবেন তাঁর সেনাপতি ও ভাই অর্জুন। তুমি সে ঘোড়াটিকে আটকে রেখো। সে ঘোড়াকে মুক্ত করতে এসে অর্জুন তোমায় স্পর্শ করবেন—আর তাতেই তোমার শাপমুক্তি ঘটবে।"

মুনি এখানেই থামলেন। এতক্ষণ অর্জুন নিঃশব্দে তাঁর কাছ থেকে সব ইতিহাস শুনলেন। মুনি তখন অর্জুনকে বললেন—"বোধকরি এখন তোমায় আর কিছু বলতে হবে না। যাও ঘোড়াকে মুক্ত করো—মুক্ত করো ঐ পাষাণরূপী ব্রাহ্মণীকে। তুমি বিজয়ী হও।"

অর্জুন মুনিকে প্রণাম করে যথাস্থানে উপস্থিত হলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন পাথরকে—সাথে সাথে পাথরের জায়গায় উঠে দাঁড়ালেন এক নারীমূর্তি—এক ব্রাহ্মণী। মুক্ত হ'লো যজ্ঞাশ্ব।

এদিকে চণ্ডিকা এতদিন পর স্বরূপ পেয়ে আনন্দে দিশেহারা। কৃতজ্ঞতার সুরে এক শ্বাসে তিনি অর্জুনের গুণকীর্তন করতে করতে নিজ আলয়ের দিকে পা বাড়ালেন।

আর অর্জুন ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়ে নিজে পুনরায় ছুটতে লাগলেন তার পেছনে পেছনে।

* * * *

অর্জুনের ঘটনাবহুল ঐ যাত্রা সফল হয়েছিল—সফল হয়েছিল রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

চব্বিশ পরগনা জেলার মনিরামপুর হইতে শ্রীমতী রেবা হালদার তাঁর স্বর্গগতা কনিষ্ঠা ভগিনী রেখা হাজরার পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺রেখা হাজরা স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

দুরারোগ্য ব্যাধির অবসানকল্পে চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি সার্থক অবদান

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩০শে আশ্বিন। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী পৌষ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার পনের টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার দশ টাকা**

"সুব্রত দাশগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন

কৃষ্ণা আচার্য

মহারাজ দুর্যোধনের মনে শান্তি নেই। পাণ্ডবদের কপট পাশা খেলায় হারিয়ে বনে পাঠিয়েও তাঁর মনে শান্তি নেই, কারণ এই বনবাসের পর পাণ্ডবরা ফিরে তাঁদের রাজ্য দাবি করবেন। তাই তিনি ভাবছেন কি করে পাণ্ডবদের ধ্বংস করা যায়। এখন পাণ্ডবরা নিঃসম্বল, নিঃসহায় হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই-ই-তো উপযুক্ত সময় ওঁদের ধ্বংস করার। কিন্তু এমন কোন উপায় বার করতে পারছেন না তিনি, যাতে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করা যায় অথচ লোকে কিছু বুঝতে না পারে। ভাবছেন, কিন্তু কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না।

এমন সময় একদিন ঋষি দুর্বাসা তাঁর দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের রাজসভায় এসে হাজির হলেন। দুর্যোধন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ঋষি দুর্বাসাকে আপ্যায়িত করতে। না ব্যস্ত হলে উপায় আছে? ঋষি দুর্বাসা বড় তপস্বী হলে কি হবে! ভীষণ রাগী। সামান্যতম ত্রুটি হলেই অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দেবেন। ঋষিকে যথাযথ অ্যাপায়ন করে দুর্যোধন মনে মনে একটা ফন্দী আঁটলেন। মনে মনে ভাবলেন, পাণ্ডবরা এখন নিঃসম্বল। এখন যদি এই সশিষ্য দুর্বাসাকে ওঁদের কাছে পাঠান যায়, তাহলে ওঁরা যথাযথ ঋষির মর্যাদা রাখতে পারবেন না। আর তা না পারলে ঋষির শাপে ভস্ম হয়ে যাবেন।

দুর্যোধনের আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা তাঁকে আশির্বাদ করে পাণ্ডবদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্যোধন এই সুযোগই খুঁজছিলেন। বললেন,—'পাণ্ডবরা এখন কাম্যক বনে আছেন। আপনি যদি ওঁদের অতিথি হন তাহলে ওঁরা খুব খুশী হবেন। তবে ওঁদের কাছে গেলে একটু রাত করে যাবেন।'

—'ঠিক আছে, পরে আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব'—এই বলে দুর্বসা খুশী মনে বিদায় নিলেন।

দুর্যোধন ঋষিকে পাণ্ডবদের একটু রাত করে যেতে বললেন যাতে তখন দ্রৌপদীর আহার শেষ হয়ে যায়, কারণ তিনি দ্রৌপদীর অক্ষয় হাঁড়ির কথা জানতেন। যে হাঁড়ির কৃপায় দ্রৌপদী প্রচুর খাদ্য যোগাড় করতে পারতেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তিনি নিজে আহার করেন।

—'কৃষ্ণা আমায় কিছু খেতে দাও।'

দুর্যোধনের কথামতোই একদিন রাত করে দুর্বাসা ঋষি তাঁর দশহাজার শিষ্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। সশিষ্য দুর্বাসাকে দেখে যুধিষ্ঠিরের তো চক্ষুস্থির। কি করে তিনি এত রাতে সশিষ্য ঋষির সেবা করবেন! দ্রৌপদীর যে আহার শেষ হয়ে গিয়েছে। দুর্বাসা যুধিষ্ঠিরকে আহারের আয়োজন করতে বলে সশিষ্য প্রভাস তীর্থে স্নান করতে গেলেন। আর যুধিষ্ঠির ছুটে গেলেন দ্রৌপদীর কাছে।

দ্রৌপদী সব শুনে বললেন, 'আর তো কোন উপায় নেই, রাজন। আমার যে আহার শেষ হয়ে গিয়েছে।'

যুধিষ্ঠির আর ভাবতে পারছেন না। ঋষি এখনি এসে পড়বেন। এসে যদি দেখেন আহারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, তাহলে রেগে শাপ দিয়ে তাঁদের পাঁচ ভাইকে ভস্ম করে দেবেন। দ্রৌপদী তাঁদের আসন্ন বিপদের কথা ভেবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন,—'হে করুণাসিন্ধু কৃষ্ণ, হে অনাথের নাথ, হে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন উপায় কর প্রভু। তুমি একদিন কৌরব-সভায় মহা-অপমানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিল, আজ আমাদের ঋষির শাপ থেকে রক্ষা কর প্রভু।'

দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না। তিনি দ্রৌপদীর কাছে কাম্যক বনে এসে হাজির হলেন। শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত হতে দেখে পাণ্ডবরা যেন প্রাণ

পেলেন তখন তাঁদের সমূহ বিপদের কথা জানালেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন কথা না বলে সোজা দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন,—'কৃষ্ণা আমায় কিছু খেতে দাও। আমার বড় খিদে পেয়েছে।'

দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে জানালেন ঘরে কোন খাবারই নেই। আর তাঁর নিজের খাওয়া শেষ হওয়াতে রাঁধবার হাঁড়িও শূন্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—'তবু হাঁড়িটা খুঁজে দেখ। যদি এক কণাও ভাত থাকে, তা দিয়ে খানিকটা জল পান করলে খিদেটা কতক কমবে।'

শ্রীকৃষ্ণের কথায় দ্রৌপদী হাঁড়ি খুঁজে এক কণা ভাত ও একটি শাকের পাতা পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই খেয়েই জলপান করলেন।

'আঃ! খিদেটা গেল।' বলে উদর পরিপূর্ণ হওয়ার এক উদ্গার তুললেন।

এদিকে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। প্রভাস তীর্থে দুর্বাসা ও তাঁর দশ হাজার শিষ্যরও উদর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাঁরা কেবল উদ্গার তুলতে লাগলেন। খাওয়া তো দূরের কথা, খাওয়ার চিন্তা করাও তাঁদের কষ্টকর হল। তাঁরা সেখানেই যে যেখানে পারলেন শুয়ে পড়লেন।

দ্রৌপদীর কাছ হতে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—'এবার বলুন আপনাদের কথা শুনি।' যুধিষ্ঠির বিস্তৃতভাবে গভীর রাতে দুর্বাসা ঋষির সহসা আগমনের কথা জানালেন। সব শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—'আপনারা বিশ্রাম করুন, কোন ভয় নেই। ঋষি আজ রাতে আর ফিরবেন না।'

সত্যিই ঋষি দুর্বাসা সে রাত্রে আর ফিরলেন না। পরদিন প্রাতে ফিরে লজ্জিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন,—'ধর্মরাজ কালকে না আসতে পারার জন্য আমি লজ্জিত ও দুঃখিত।'

যুধিষ্ঠির বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মায়ার বলে গত রাত্রে ঋষি আসতে পারেন নি, তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে ঋষিকে বললেন,—'তাতে কি হয়েছে ঋষি ঠাকুর! আজই আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।'

দ্রৌপদী তখন তাঁর আশ্চর্য হাঁড়ির কৃপায় দুর্বাসা আর তাঁর দশ হাজার শিষ্যকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করলেন। ঋষি খুব খুশী হয়ে যাবার সময় পাঁচ ভাইকে আশীর্বাদ করে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অলৌকিকভাবে পাণ্ডবরা ঋষির শাপ হতে রক্ষা পেলেন।

ভক্ত বিপদে পড়ে ভগবানকে ডাকলে তিনি না এসে থাকতে পারেন না। তাই ভগবানের অন্য এক নাম বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন। তিনি আসেন এবং অলৌকিকভাবে ভক্তকে রক্ষা করেন।

নতুন ধাঁধা

১। একটি ক্লাসের অর্ধেক ছেলে পড়াশুনা করে, সিকি ভাগ অনুপস্থিত থাকে, ছয় ভাগের এক ভাগ খেলা করে ও বাকী তিনজন ঘুমায়। বলত ঐ ক্লাসে মোট কয়জন ছেলে?

—এম. আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী।

২। বিয়োগ—

চ	ব	ম	শ
	১	২	৩
চ	চ	চ	চ

বাংলা অক্ষরগুলির পরিবর্তে কি কি অঙ্ক বসবে বল তো?

—আলোক, শোভন, আরতি ও উদয়।

৩। নন্দ তাদের বাইরের ঘরে বসে আছে, এমন সময় তিনজন বিদেশী লোক সেই ঘরে প্রবেশ করল। নন্দ তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে একজন খানিকটা খাবার জিনিস নন্দকে খেতে দিল, আর একজন একটা হাতকড়া বের করে নিজের হাতেই পরাল, বাকি জন নন্দর গায়ের জামাটা ধরে একবার টানল। বল তো তোমরা, তাদের পরিচয় কি?

—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

গত আষাঢ় সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। লগুড় ২। পালা ৩। বাতাস

গত আষাঢ় সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—রীণা, রীতা, অমর, অসিত, অলক, কুন্তল, বুলা, ধুলা ও শুভাশীষ—তালতলা এভেনিউ; ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী—বাসুদেবপুর মেন রোড; টুটুন দে—গোপালচন্দ্র বসু লেন; সন্দীপ, অমল, সন্তোষ, পরেশ ও দেবাশীষ—জামির লেন; সোমা ও রাখী বসু—রামকান্ত মিস্ত্রী লেন; গোপা, অসিত, দিদা, দাদু, মা ও বাবা—সি. আই. টি. রোড; সমীরণ, সংগীতা, বাবা ও মা—গরচা ফার্স্ট লেন; গোপেন্দু, শুভেন্দু, দিব্যেন্দু, ঝর্ণা ও তোতা—নেহেরু কলোনী; সোনালী ও তাতু রায়—কবীর রোড; কৌশিকী মজুমদার—টালিগঞ্জ; পিকলু, টুবলু, তোতন ও টুলটুল—পূর্ণ মিত্র লেন; রিন্টু ও পিন্টু বিশ্বাস লেক গার্ডেন্স্।

২৪ পরগনা—দীপ্তি, তৃপ্তি, স্মৃতি, বীথি ও শুভজিৎ বসাক—কাঁচড়াপাড়া; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; সৌমিত্রিশঙ্কর ও সুশান্তশঙ্কর উকিল বারাকপুর; মিতা, টুম্পা, রত্না, পার্থ, পুষ্পল, পূর্বা ও মা—বারাসত; অসীম, সৌমেন, দেবাশীষ, অশোক, খোকন, ছন্দা প্রভৃতি—কাঁচড়াপাড়া; টুটু, বিল্টী, দেবাশীষ, স্নেহাশীষ, নিবেদিতা ও জেঠু—কাঁচড়াপাড়া।

হাওড়া—শিপ্রা, অনিমা ও প্রবোধ চ্যাটার্জী—

[illegible] পশুপতি প্রভৃতি—[illegible] দীপু, প্রীতি, ভক্তি ও [illegible]

বর্ধমান—[illegible] রায়—আসানসোল; [illegible] কৌশিক রায়—দুর্গাপুর; [illegible] পলিটেকনিক।

নদীয়া—[illegible]—শান্তিপুর; মাধুরী দাস—শান্তিপুর; [illegible], রিজা, দাদু, বাবা ও কাকা—[illegible]; [illegible], রবীন ও চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী—[illegible]।

হুগলী—মৃণাল, কাবেরী ও মিতা—উত্তরপাড়া; টুনটুন ও গৌতম ব্যানার্জী—উত্তরপাড়া।

মেদিনীপুর—দেবদাস, তুলসী, চকা ও মেজদা—পাটনাবাজার।

মালদহ—মোহন ও বুলবুল সান্যাল—ঝলঝলিয়া।

বীরভূম—সুব্রত, সুমিতা, সুতপা ও সুমনা হাজরা—আহমদপুর; সৌমিত্র, শিখা, অনুরাধা ও আশীষ ভৌমিক—দুবরাজপুর।

পুরুলিয়া—কাকলী, তমালী, বৈশাখী ও কৌশিক চৌধুরী—পুরুলিয়া; ত্রিদিব, বাসবী, সোমা, প্রদীপ, আলোক ও অরুণ—পাড়া।

বিহার—দীপু, সোমু, বাবু ও বাবী সামন্ত—পাটনা-৬; রুবেন, তনুশ্রী ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫; রমেশ, সুভাষ, বিকাশ, স্বপ্না ও আভা শেঠ—সাকচি; সুব্রত, সুমন্ত ও স্বপন—অনন্তপুর।

উড়িষ্যা—মা, শঙ্কর, গৌতম, স্বাতী, সুপ্রিয়, সুব্রত ও শমিতা ব্যানার্জী—পুরী; পিকলু, পাপাই, পিকাই, তুহিন ও টোটো চক্রবর্তী—মেরিয়াবাজার।

মধ্যপ্রদেশ—মা, সুবীর, জ্যোতি, দীপ্তি, উৎপল, জয়ন্ত ও প্রশান্ত—রায়পুর; চন্দন, স্বপন, নন্দন, বড়দি, মুনা, রুবি ও সোনা ব্যানার্জী—রায়পুর।

শারদীয়া সংখ্যা

নব কল্লোল

এবার সাতটি উপন্যাস লিখেছেন

বিমল মিত্র (উপন্যাস)
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সুবৃহৎ কাহিনী)
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
দৃষ্টিহীন (উপন্যাস)
সুধীন্দ্রনাথ রাহা (ইংরেজী সাহিত্যের উপন্যাস)
মায়া বসু

কালকূট (উপন্যাস)
আশাপূর্ণা দেবী (উপন্যাস)
নীহাররঞ্জন গুপ্ত („)
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
অদ্রীশ বর্ধন
আরো অনেকে—

অনেক ফিচার, কার্টুন, ডাক্তারী, রূপসজ্জা

মূল্য—পরে জানান হবে

প্রাপ্তিস্থান—দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

দেড়ো-ডাক্তারের ফ্যাসাদ

গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ

দেড়ো-ডাক্তারকে রাজিশুদ্ধ লোক ভক্তি শ্রদ্ধা করত দুটো কারণে।
প্রথমতঃ, তাঁর ওষুধ পড়লেই লম্বা দিতো যে কোনো রোগ—অক্কা পেতো রোগজীবাণু।
দ্বিতীয়তঃ, তাঁর দাড়ি দেখতে লোক আসত দেশ দেশান্তর থেকে। আহা, সে দাড়ি দেখবার মত দাড়ি। ডাক্তারের দুগুণ লম্বা তেমনি মোটা!
অথচ বিখ্যাত এই দাড়ি নিয়েই দেড়ো ডাক্তার পড়লেন এক মহা ফ্যাসাদে!

একদিন গভীর রাতে।

ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

ঠক! ঠক!

ইস! এত রাতে আবার কে ডাকাডাকি করে!

দরজা খুলে দেখলেন এক থুত্থুরে বুড়ো।

ডাক্তারবাবু! আমার মেয়ের কঠিন রোগ হয়েছে। কিছু খেতে চাইছে না। আপনি ওষুধ দেবেন চলুন!

আশ্চর্য! বৃষ্টি নেই তবু এ দেখছি ভিজে ঢোল হয়ে এসেছে!

দেড়ো-ডাক্তার কাউকে না বলতেন না। তাই অত রাতেও ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরোলেন বুড়োর সঙ্গে।

শহরের ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে এসে পৌঁছালো দুজনে।

মরেচে! এ যে হড়বড় করে কুয়োয় নেমে গেল! মনে হয় শুকনো কুয়ো, দেখি উঠে!

ও বাবা! এতো কানায় কানায় ভর্তি! ব্যাপার সুবিধের নয়, এই বেলা সরে পড়ি!

কিন্তু পালাতে যেতেই

হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মেয়েকে ওষুধ না দিয়ে যাবে কোথা?

কে তুমি?

পাতাল-জাদুকর মোবাটা!

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

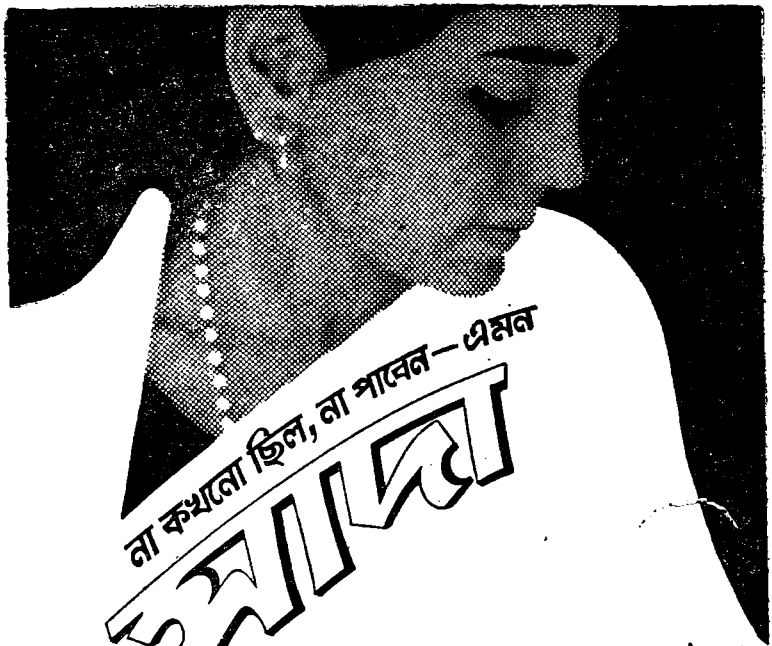

সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়

সাবানের তুলনায় অর্ধেক মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক

ডেট কেক

Shilpi HPMA-38a/72 Ben

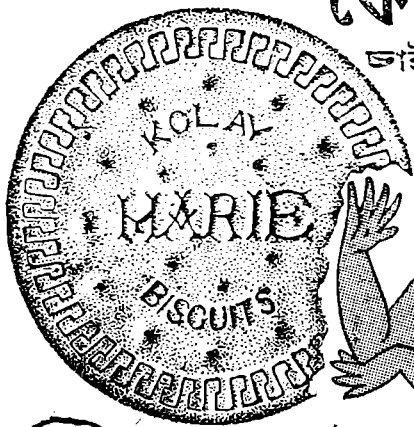

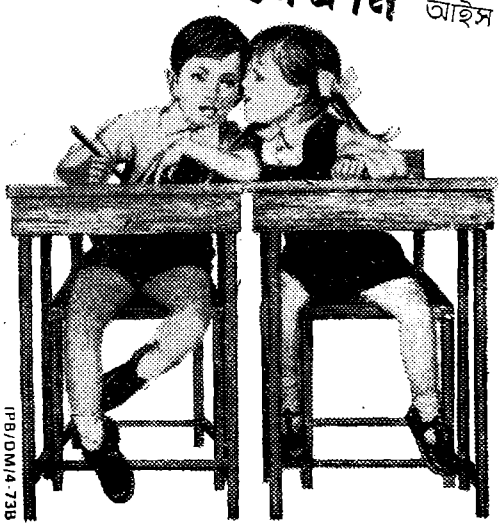

“আমার প্রিয় কোলে মারী
চাই-ই চাই”—রিনু
KOLAY
MARIE
BISCUITS
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা-১০
PPS-KB-10/66B

ছুটির পরেই হিমক্রীম আইস ক্রীম
হিমক্রীম
DIRECTORATE OF DAIRY
হিম ক্রীম আইস ক্রীম
খাঁটি দুধের তৈরী—
মোলায়েম আর মিষ্টি মধুর
আস্বাদে ভরা।
ডিরেক্টরেট অফ
ডেয়ারী ডেভলপমেণ্ট
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রস্তুত।
IPB/DM/4-73B

বর্ষাকালে অসুখ বিসুখ এড়াতে হলে হরলিক্‌স খান।

"এর পুষ্টি-গুণ রোগ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে আর স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।"

—একথা বলেন সুচিত্রা দেবীর ডাক্তার।

বর্ষাকালে দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকে। তাই সুচিত্রা দেবী এমনিতেই সাবধানে থাকেন আর এই সময়টাতে বাড়ীর প্রত্যেককে হরলিক্‌স খেতে দেন যাতে অসুখ বিসুখ না হয়।

ওঁর ডাক্তারও সেই পরামর্শ দেন—কারণ হরলিক্‌সে পুষ্টির সব কটি গুণ আছে—যা রোগ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

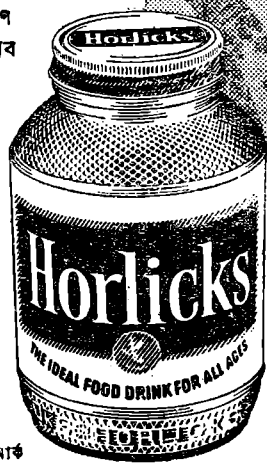

হরলিক্‌স
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্‌স' রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HMM—3206A BEN-2

তপোবন

এবার পূজায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত
পূজাবার্ষিকীর নাম **তপোবন**

তপোবন-এ ছেলেমেয়েদের মন-ভোলান লেখা এবার লিখবেন এদেশের সমস্ত বিখ্যাত সাহিত্যিকরা। তাছাড়া থাকবে ছবিতে গল্প, কার্টুন এবং অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি।

মূল্য ৮·০০ টাকা

অনামিকা

মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত **অনামিকা**

নাম **অনামিকা** হলেও বহু নামী লেখকের লেখায় ভরা এই বই ছেলেদের মন ভোলাবে। মূল্য ৫·০০ টাকা

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

গল্প বলি শোন

শোনবার মত গল্প করে বলতে জানেন এই লেখক। কখনও পথ চলতে চলতে, কখনও রূপকথা রাজ্যের মনমাতানো কাহিনী লেখকের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে। এই সব গল্পে ভরা এই বই পূজার এক নতুন উপহার। মূল্য ৫·০০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

রোমাঞ্চকর চিত্রকাহিনী

শুধু ছবি আর ছবি। সিনেমার কাহিনীর মত করে আঁকা। অসংখ্য ছবির মধ্যে দিয়ে নানা দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর গল্প বলা হয়েছে। **মূল্য ৫·০০ টাকা**

ছোটদের বুক অব নলেজ

বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশ করেছে ছেলেদের জন্য **বুক অব নলেজ**। যা সত্য তাই বিস্ময়কর। **বুক অব নলেজ** দেখলেই তা বোঝা যায়। **মূল্য ২৫.০০ টাকা**

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-৯

অন্তত বাচ্চাদের কথা ভেবে খাঁটি মশলা কিনুন—

সানরাইজ

হ'ল সেই মশলা-
১০০% খাঁটি-
স্বাদে গন্ধে ভরপুর

শুধুমাত্র স্বাদের জন্যই নয়—মশলা তৈরীর ব্যাপারে আমরা সবার আগে বিশুদ্ধতার দিকে নজর দিই। খাঁটি কাঁচামাল কেনা হয়—আধুনিক মেশিনে তৈরী হয় সানরাইজ মশলা—নিজস্ব ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করা হয়। তাইতো সানরাইজ আজ দেশের সেরা মশলা।

দোকানে খাঁটি মশলা চাইলেই ▷ সানরাইজ পাবেন।

Newfields P.B. 12.73.

প্রকাশ ব্রাদার্স ৭৪/এ, নলিনী সেঠ রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-৮৩০১